প্রয়াগধামে

কুম্ভ-মেলা

"ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"

শ্রী[illegible]নারঞ্জন গুহ প্রণীত

প্রয়াগধামে

কুম্ভ-মেলা।

"ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, কলিকাতা।

১৯০৭।

মূল্য।০ চারি আনা।

কলিকাতা.

বহুবাজার, ১৪ নং মদন বড়ালের লেন,

লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে

শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত,

ও

৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীসত্যরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নিবেদন।

পূর্ব্বে বিশেষ সঙ্কল্প ছিল না, একদিন প্রাণের টানে হঠাৎ কুম্ভ-মেলায় ছুটিয়া গেলাম। মেলার বিষয় কিছু লিখিব এমন কথা তখন মনেও হয় নাই, মনের ভাব সেরূপ থাকিলে আমার মেলা দেখাই বৃথা হইয়া যাইত। কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধু-বান্ধবদের নিকট মেলার কথা বলিতে যাইয়া লিখিতে ইচ্ছা হইল, অনেকে অনুরোধও করিলেন। গত চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচ সংখ্যা "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় প্রয়াগধামে "কুম্ভ-মেলা" নাম দিয়া, পাঁচখানি পত্র প্রকাশিত করিলাম। তখন অনেকে এই বিবরণ গ্রন্থবদ্ধ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত সেই পাঁচখানি পত্রকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া "প্রয়াগধামে কুম্ভ-মেলা" ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থ কুম্ভ-মেলার প্রকৃত ইতিহাস নহে। ইতিহাস লিখিতে হইলে, অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিতে হইত; ইহাতে সে সমস্ত নাই। অনেকে বলিয়াছেন, "কেবল গুণের কথাই বলা হইয়াছে, দোষের কথা কি কিছুই নাই? প্রকৃত সমালোচনা করিতে হইলে, দোষ-গুণ উভয়ই প্রকাশ করা উচিত।" আমার নিবেদন, আমি সমালোচনার জন্য কিছু লিখি নাই। বিশেষতঃ সেই মেলাস্থলে, স্নানমাহাত্ম্যে, সাধুসঙ্গে, আমার ন্যায় হীন ব্যক্তিরও দোষ-দর্শন-প্রবৃত্তি জাগরিত ছিল না।

গুরুভাইদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, হরিনাম শুনিতে শুনিতে তুমি শান্তিধামে গমন করিয়াছ। একটি ধর্ম্মস্রোতের মধ্য দিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছ। এত সৌভাগ্য কাহার হয়? তোমার ন্যায় পুণ্যবান্ কে? মৃত্যুশয্যায় এমন করিয়া কে বলিতে পারে, "মৃত্যুর জন্য আমার কোন ভয় নাই, রোগযন্ত্রণা ভিন্ন আমার আর কোন যন্ত্রণা নাই, আমি শান্তির সহিত যাইতেছি।" পুণ্যবান্, তোমারই পুণ্যে তোমার পতিব্রতা স্বাধ্বী স্ত্রী সান্ত্বনা লাভ করিবেন এবং আমরাও জুড়াইব।

প্রিয়তম, আমাদের কুম্ভ-মেলার স্মৃতির সহিত তোমার স্মৃতি জড়াইয়া রহিয়াছে; বিশেষতঃ সাধুদিগের মর্য্যাদা তোমার অধিক কেই বা বুঝিবে? তাই সাধু-পদরজ-মাখা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমারই পবিত্রনামে উৎসর্গ করিলাম।

প্রেমানুগত

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

উৎসর্গ।

—:•০:—

সাধুনিষ্ঠ পরলোকগত

শ্রীমান্ সত্যকুমার গুহ ঠাকুরতা

ভগবদ্ভক্তেষু।

প্রিয়তম,

সংসারের সম্বন্ধে তুমি আমার ভ্রাতষ্পুত্র এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে গুরু-ভাই ছিলে। প্রথম সম্পর্ক লোপ হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় সম্বন্ধ অনন্তকাল থাকিবে। তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছ, মৃত্যু আমাদিগের নিকট হইতে তোমাকে পৃথক্ করিয়াছে, কিন্তু তোমার লজ্জামাখা মধুর প্রেম, অকপট দীনহীন ভাব, একস্রোত-ধর্ম্মানুরাগ, প্রাণগত সাধুভক্তি, আমাদিগের নিকট তোমাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। সংসারের আত্মীয়েরা তোমাকে চিনিতে পারে নাই; অপার্থিব ধন তুমি, অনাদরে গড়াগড়ি গিয়াছ। আমরাই কি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে আদর করিতে পারিয়াছি? এত শীঘ্র যে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে, তাহা আমরা ভাবি নাই। তুমি ত চলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমাদিগকে নির্জনে সজল-নয়নে তোমার নাম স্মরণ করিতে হয়। তোমার ন্যায় সৌভাগ্য-শালী কে? প্রয়াগধামে কুম্ভমেলায় একমাস কাল সাধুসঙ্গে থাকিয়া, তথা হইতে নবদ্বীপধামে প্রেমাবতার মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া, অদ্বৈত-পাট শান্তিপুরে গুরু এবং

বড়ই ভয়ে ভয়ে লিখিয়াছি। সংসারের ধূলা-মাখা হাতে স্বর্গের ফুল ধরিতে কাহার না ভয় হয়? ভরসা এই যে, ভক্ত-চরিত্র-মহিমা আমার ধৃষ্টতাকে অতিক্রম করিয়াও জীবের কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

২০শে আষাঢ়,
১৩০১ সাল।

নিবেদক
গ্রন্থকার।

প্রয়াগধামে

কুম্ভ-মেলা।

আরম্ভ।

গত মাঘ মাসে প্রয়াগধামে ত্রিবেণীক্ষেত্রে কুম্ভমেলার মহাধিবেশন সন্দর্শন করিয়া প্রাণে যে অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইচ্ছা হয় সকলের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া সুখী হই।

প্রথমেই মনে হয় স্থান-মাহাত্ম্য। ভারতের শ্যামলবক্ষ-প্রবাহিতা ধনধান্যের নিদানভূতা বিমলসলিলা গঙ্গাযমুনা এই প্রয়াগধামে একত্রে মিলিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে সরস্বতী নামে আর একটী নদী গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে মিলিয়া এ স্থানকে ত্রিবেণী নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই তিনটী পয়োস্বিনীর সলিলে ভারতের আদ্যন্ত ইতিহাস, বেদ বেদান্ত, স্মৃতি-দর্শন, কাব্য-পুরাণ, গণিত-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, যাগ-যজ্ঞ, ধ্যান-ধারণা, শৌর্য্য-বীর্য্য,

ও স্বাধীনতা, সমস্তের স্মৃতিই মিশ্রিত রহিয়াছে। আবার এই ত্রিধারার ন্যায় তিন জাতির স্মৃতিস্রোতও ইহার সহিত প্রবাহিত হইতেছে। ত্রিবেণী-সঙ্গমের ঠিক বক্ষোপরি এলাহাবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ, এই দুর্গ ইস্‌লাম রাজ্যের বিগত গৌরব ঘোষণা করিতেছে। দুর্গের শিরোদেশে বৃটিস্-কেতন সগর্ব্বে উড়িতেছে, দুর্গের অভ্যন্তরে হিন্দুর প্রাচীন স্মৃতি লইয়া অক্ষয়-বট বিদ্যমান রহিয়াছে, এই স্থানে সেই ভরদ্বাজাশ্রম, যে আশ্রমে বনগমনকালে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও জানকীসহ আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে এই স্থানে শমদন-দয়ানিধান পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি ভরদ্বাজের মুনিজনমনোহর পবিত্র আশ্রমে প্রতিবৎসর মাঘ-মকর-সংক্রান্তিতে মুনিঋষিগণ সমবেত হইয়া ত্রিবেণী-স্নান, অক্ষয়-বট স্পর্শ এবং ভগবানের পাদপদ্মপূজা করিতেন। সেই ঋষিসমাজ পরস্পর হরিগুণগান, ধর্ম্মবিধি প্রণয়ন, ব্রহ্মনিরূপণ, তত্ত্ববিভাগ এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্‌ভক্তির আলোচনা করিতেন *। এই

---

* ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা।
জিনহিঁ রামপদ অতি অনুরাগা॥
তাপস শম দম দয়া নিধানা।
পরমারথ-পথ পরম সুজানা॥
মাঘ মকরগত রবি যব হোই।
তীরথ পতিহিঁ আওসব কোঁই॥
দেবদনুজ কিন্নর নর শ্রেণী।
সাদর মজ্জহিঁ সকল ত্রিবেণী॥
পূজহিঁ মাধব-পদ জলজাতা।
পরষি অক্ষয়-বট হরষিত গাতা॥
ভরদ্বাজ আশ্রম অতি পাবন।
পরম রম্য মুনিবর মন ভাবন॥
তঁহা হোই মুনি ঋষয় সমাজা।
জাঁহি যে মজ্জন তীরথ রাজা॥
মজ্জহিঁ প্রাত সমেত উচ্ছাহা।
কহহি পরস্পর হরিগুণ গাহা॥
ব্রহ্ম নিরূপণ ধর্ম্মবিধি বরণহিঁ তত্ত্ব বিভাগ।
কহহিঁ ভক্তি ভগবন্ত কি সংযুত জ্ঞান বিরাগ॥
য়িহি প্রকার ভরি মকর নহাহী।
মুনি সব নিজ নিজ আশ্রম জাহি॥
প্রতি সম্বৎ অস হোই আনন্দা।
মকর মজ্জ গয়োনাহি মুনি বৃন্দা॥

তুলশীদাসের রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৫৬।৫৭ দোঁহা।

স্থানের দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত শ্রীযুক্ত রূপ গোস্বামী মহাশয়কে দীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। আহা! ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়া প্রাণ যে কত ভাবেই বিভোর হয়, ভাবাবেশে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি এলাইয়া মন যে কোথা হইতে কোথায় ছুটিয়া যায়, তাহা কি প্রকাশ করিয়া বলা যায়? এই পুণ্যক্ষেত্রে, এই অনন্ত-কীর্ত্তির স্মৃতিমন্দিরে, গত মাঘে কুম্ভমেলার অধিবেশন হইয়াছিল। পাঠক একবার মানস-চক্ষে এই ক্ষেত্র দর্শন করিয়া মেলার বিবরণ পাঠ করুন।

দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গা ও পূর্ব্ববাহিনী যমুনা যেথানে মিলিত হইয়াছে, সেই সমকোণ ক্ষেত্রেই প্রয়াগ-দুর্গ। দুর্গের উত্তর পার্শ্ব দিয়া সহর হইতে প্রশস্ত রাজপথ গঙ্গায় আসিয়া মিশিয়াছে। এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিপণিশ্রেণী। এই স্থান হইতেই মেলা আরম্ভ। গঙ্গার পশ্চিমপারে মেলার জন্য হাট বাজার, মেলার জন্য ডাকঘর, কল্পবাসিদিগের কুটীর এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচার ক্ষেত্র। মহাত্মা দয়ানন্দের আর্য্য-সমাজের প্রচার গৃহ বিশেষ জমকাল হইয়াছিল। তাহার অনতি-দূরে শাস্ত্রার্থ প্রচারিণী সভা—এই সভা আর্য্য সমাজের বিরোধী। এতদ্ব্যতীত খ্রীষ্টান মহাশয়েরা প্রচার ক্ষেত্র খুলিয়াছিলেন। মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস হিন্দুশাস্ত্রমতে বিশেষ পুণ্যজনক; এজন্য প্রতি বৎসরই এই সময় অনেক নরনারী এথানে এক মাসকাল বাস করেন, ইহাকে কল্পবাস বলে। এ বৎসর কুম্ভমেলা হওয়াতে কল্পবাসীর সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ-কুটীরে কল্পবাসিগণ বাস করিতেন। এই কুটীরগুলি প্রকৃতই কুটীর, বলিতে গেলে অতি সামান্য কিঞ্চিৎ তৃণাচ্ছাদন

মাত্র। বৃষ্টির ধারার কথা দূরে থাকুক উহা রজনীর হিমানী ও সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারে না। কল্পবাসিদিগের কুটীর কত হাজার উঠিয়াছিল, বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাতে তীরভূমি একটী বৃহৎ বন্দরের ন্যায় হইয়াছিল। অসংখ্য নরনারী দুরন্ত শীতে কত ক্লেশেই একমাসকাল রজনী যাপন করিয়াছেন। স্নানের পূর্ব্বদিন অযুত অযুত নরনারী কোথাও আশ্রয় না পাইয়া এলাহাবাদের শীতে মাঘের হিমানীতে সম্পূর্ণ অনাবৃত নদীতীরে গাত্রবস্ত্র মাত্র অবলম্বন করিয়া যামিনী যাপন করিয়াছেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মার্থ ক্লেশ স্বীকার দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

গঙ্গার পশ্চিম পারে এলাহাবাদ এবং পূর্ব্বপারে ঝুঁসি। মধ্যস্থলে গঙ্গাগর্ভে প্রকাণ্ড চড়া, ক্ষুদ্র একটী দ্বীপের ন্যায়। এই চড়া ও ঝুঁসির মধ্যে অনতি বিস্তৃত একটী গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত। এলাহাবাদ হইতে চড়ায় যাইতে বিস্তৃত নৌসেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। চড়া হইতে ঝুঁসি যাইতে হইলে এই পুল পার হইয়া প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী দারাগঞ্জ নামক স্থানের অপর একটী সেতু পার হইয়া যাইতে হয়। ইহাতে চড়া হইতে ঝুঁসি প্রায় তিন মাইল ব্যবধান হইয়। চড়াতেই অধিকাংশ সাধু-সন্ন্যাসীদের আসন স্থাপিত হইয়াছিল; ঝুঁসিতেও কতক সাধু-ছিলেন।

কুম্ভমেলা বিষয়টা কি, তাহা আগে বলা উচিত। ইহা সাধুদিগের একটী কংগ্রেস। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-গণ ইহাতে একত্রিত হন, প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে এক এক স্থানে এই মেলার অধিবেশন হয়। গত কুম্ভ হরিদ্বারে হইয়াছিল, এ বৎসর প্রয়াগে হইয়াছে, আগামী তৃতীয় বৎসরে পঞ্চ-

বটীতে এবং তৎপরে এইরূপ উজ্জয়িনীতে হইবে। ঘুরিয়া আবার ১২ বৎসর পরে প্রয়াগে হইবে। কতশত বৎসর হইতে এই মেলা চলিয়া আসিতেছে তাহার ইতিহাস নাই! ইহার কোন উদ্যোগ-কর্ত্তা নাই, আবাহন কর্ত্তা নাই, সংবাদদাতা নাই, সভাপতি নাই, সম্পাদক নাই এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা নাই। কুম্ভমেলা সকলেরই মেলা, সকলেই স্বয়ং আহূত। এই প্রকাণ্ড চড়া এবং ঝুঁসি প্রভৃতি যে সকল স্থানে সাধুদিগের আসন ও আশ্রম হইয়াছিল উক্ত স্থানের জমিদার এই এক মাসকাল তাহা নিষ্কর দিয়াছেন।

কুম্ভমেলায় লোকসংখ্যা কত হইয়াছিল, অনুমান করিতে আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। লোকপ্রবাহ, দূর হইতে দেখিলে বিচিত্র বসনে সুসজ্জিত ঘনসন্নিবিষ্ট চিত্র-পুত্তলিকাশ্রেণীর ন্যায় স্থির বোধ হইত। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর এই লোকারণ্য। গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। শুনিতে পাই, লোকসংখ্যা অন্যূন দশ লক্ষ হইয়াছিল। এরূপ জনসমাগম পৃথিবীতে নাকি আর দেখা যায় নাই। এত জনসমাগম কিসের জন্য, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নয়, ক্রয় বিক্রয়ের জন্য নয়, কোন প্রদর্শনীর জন্য নয়, কেবলমাত্র স্নান ও সাধুদর্শন জন্য। এরূপ ব্যাপারে এরূপ জনতা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। উৎসাহ, উদ্যম, অনুরাগ, নিষ্ঠা, দান, সদাব্রত, বৈরাগ্য, প্রভৃতি মেলার হাওয়ার সহিত এমনই মিসাইয়া গিয়াছিল যে, প্রতিক্ষণে মনে হইত, যেন কোন নূতন জগতে আসিয়াছি। মন সংসার ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া যাইত। ইহা এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং এরূপ

অপূর্ব্ব ব্যাপার যে, চিন্তা করিলে স্বপ্নকল্পিত রাজ্য বলিয়া মনে হয়। অযুত অযুত সাধু সন্ন্যাসী, কেহ কুটীরে, কেহ বস্ত্রাবাসে, কেহ ছত্রাচ্ছাদনে; কেহ বা সম্পূর্ণ অনাবৃত বসিয়া আছেন। কেহ গৈরিকধারী, কেহ কৌপিন-বহির্ব্বাসধারী, কেহ বা শুদ্ধ কৌপিনধারী, কাহারও গাত্রে কিঞ্চিৎ আচ্ছাদন আছে কেহ বা শুদ্ধ বিভূতিভূষিত দীর্ঘ জটাধরী। হিন্দুর মনে যত প্রকার সাধু-পরিচ্ছদের ভাব আছে, সমস্তই একত্র সম্মিলিত। পুরাণে নৈমিষারণ্যের ঋষিসভার বর্ণনা পাওয়া যায়, এ দৃশ্য তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই সাধুদলে মহা মহা পণ্ডিত আছেন, মহাধ্যানী, মহাকর্ম্মী, মহাপ্রেমিক, মহাদাতা আছেন। একদিকে যেমন মেলার বাহ্য দৃশ্য অতি অদ্ভুত, অন্যদিকে ইহার আভ্যন্তরিক দৃশ্যও অতিশয় গভীর। অযুত অযুত গৃহস্থ নরনারী ভক্তিভাবে সাধুদিগকে প্রণাম করিতেছে, জানি না কিসের জন্য প্রণাম করিয়া বদন তুলিতে কত শত সরল-প্রাণ নরনারীর গণ্ডদেশ নয়নধারায় ভাসিয়া যাইতেছে। কত ধনী রাশীকৃত উপহার সামগ্রী লইয়া পাছে বা উপেক্ষিত হয়, এই ভয়ে সসঙ্কোচে সাধুদের নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দানের কি আশ্চর্য্য প্রণালী, দান গৃহিত হইলে যেন কৃতার্থ হয়। মেলার আভ্যন্তরিক বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, একটী বিশেষ কথা না বলিলে প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হইবে। এই প্রকাণ্ড মেলার সুবন্দোবস্তের জন্য রাজপুরুষগণ যাহা করিয়াছেন যেরূপ যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

অভিনিবেশ।

—— ০ ——

পাঠক, একবার মানসচক্ষে অবলোকন করুন। প্রয়াগে গঙ্গার প্রকাণ্ড চড়ায় কি এক নূতন রাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। এ রাজ্যের অধিবাসী সকলই সন্ন্যাসী, বাসগৃহ কাহারও আকাশ, কাহারও ছত্র, কাহারও কুটীর, কদাচিৎ বা বস্ত্রাবাস; পরিচ্ছদ—কৌপিন, বহির্ব্বাস, কম্বল ও গৈরিক; অলঙ্কার—বিভূতি, জটা, মালা, তিলক; সম্পত্তি ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধুনীর কাষ্ঠ: সম্বল—শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং হরিনাম। এই প্রকাণ্ড সাধু-নিবাসে হাট নাই, বাজার নাই, ক্রয় নাই, বিক্রয় নাই, কোন ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি কিছুই নাই। অন্যান্য মেলায় আট আনা লোক হইলেই ষোল আনা গোল হয় কিন্তু এ মেলায় পৌণে ষোল আনা লোকই কথা বলে না। হাজার হাজার সাধু বসিয়া আছেন, ইহাঁরা সকলেই অল্পভাষী। সাধুদর্শন করিতে দলে দলে যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের মুখেও প্রায়ই কথা নাই, হয়ত দলের মধ্যে কোন একজন কোন সাধুকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অতি সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর পাইয়া সকলে প্রণাম করিয়া অন্য সাধু দর্শনে চলিলেন। বস্তুতঃ এত লোকের স্বাধীন-সমাগমেও যে এরূপ নিস্তব্ধতা রক্ষা হইতে পারে, ইহা কখন কল্পনাও করিতে পারি নাই। মেলার শৃঙ্খলা দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। এতগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীন লোক একমাসকাল একত্র গায়ে গায়ে বাস করিলে কত বিশৃঙ্খলা এবং কত বাক্‌বিতণ্ডা কোলাহল হইবার কথা কিন্তু

এখানে সেরূপ কিছুই হয় নাই। যেমন আবহমান-কাল হইতে বিনা নিমন্ত্রণে, বিনা উদ্যোগে, এই বৃহৎ মেলা মিলিতেছে; সেইরূপ আবহমানকাল প্রচলিত কতকগুলি মহৎ রীতি এই মহামেলার শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। এস্থলে তাহার দুই একটীর উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একটী আনুগত্য। সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তিরা যখন শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া একান্ত আনু-গত্য স্বীকার করেন তাঁহাদের তখনকার সে শোভা দেখিতে প্রাণে কত আনন্দ হয়। এক এক জন মহান্তের অধীনে এক এক দল সাধু, এরূপ এক এক দলে শত শত লোক থাকেন। এই সাধুরা সকলে মহান্ত মহাশয়ের শিষ্য নহেন, কিম্বা কোনরূপ আশ্রিত নহেন। যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অধিক সকলে মিলিয়া এমন এক ব্যক্তিকে সাময়িকরূপে আপনাদের কর্ত্তা করেন। এই নির্ব্বাচনে কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ বা মনান্তর হয় না, কেবল মাত্র সকলের হৃদয়ের সরল শ্রদ্ধাই এই নির্ব্বাচন কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করে। এই নির্ব্বাচিত মহান্তের আনুগত্যই সুশৃঙ্খলার একটী কারণ। আর একটী প্রধান কারণ সার্ব্ব-ভৌমিক উদারতা। এ বস্তুটী এখানে যেরূপ দেখা গেল, পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ দেখিবার প্রত্যাশা নাই। সাধুদিগের মধ্যে শত শত বিভিন্ন ধর্ম্মমত, বিভিন্ন আচার আচরণ, বিভিন্ন প্রণালীর সাধন ভজন কিন্তু পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন-প্রণালী অতি আশ্চর্য্য। কেহ কাহারও নিন্দা করেন না, কাহারও মতের প্রতিবাদ করেন না, যাহাতে লোকের ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এইরূপই আলাপ ও আশীর্ব্বাদ করেন। এই প্রকাণ্ড মেলাতে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা শুনিয়াছি বলিয়া মনে নাই। সাধুরা

আলাপাদির সময় নিজের মতের ন্যায় পরের মতকেও সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদান করেন। ইহার একটী বিশেষ কারণ এই যে, ইহাঁরা মতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না করিয়া আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। কাহার চরিত্র কিরূপ বিকশিত হইয়াছে, কাহার আত্মা কিরূপ নির্ম্মল হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা দেখেন এবং তাই ধরিয়াই শ্রেণী গণনা করেন; কাজেই এক লক্ষ্যে সকলেরই দৃষ্টি থাকায় বাহ্য সহস্র বিভিন্নতার মধ্যেও এক প্রকার আভ্যন্তরিক একতা রহিয়াছে। এরূপ ভাব না থাকিলে একমাসকালব্যাপী বিভিন্ন মতাবলম্বী অযুত অযুত লোকের একত্র সমাবেশে, পরনিন্দা, বাক্‌বিতণ্ডা ও কলহ কোলাহলে স্থান গরম হইয়া উঠিত। অতিরিক্ত আরও কি হইত তাহা বলা যায় না।

শৃঙ্খলার একটী বাহ্য কারণ, মেলাস্থলে হাট বাজার, ক্রয় বিক্রয় ছিল না। এলাহাবাদের পার হইতে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে হইত। সাধুরা একদিনের বস্তু অন্য দিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন না, এক বেলা আহার, প্রতিদিন খাদ্য-দ্রব্য যাহা কিছু আসে যাহা কিছু ক্রয় করা হয়, তাহা সেই এক বেলায়ই নিঃশেষ; দেখিলে মনে হয় সেই হাজার হাজার লোকপূর্ণচড়া হইতে সংসারটা যেন একবারে উঠিয়া গিয়াছে। যাহা লইয়া কোলাহল, তাহার কিছুই সেখানে নাই। চড়ার অপর পারে সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় লোককোলাহল, মনে হইত চড়াটী যেন মহাসমুদ্রের কোলে এক মহাশ্মশান, তাহাতে কেবল অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড এবং অগণিত জটাজুটধারী শ্মশান-বিহারী সদাশিব।

শৃঙ্খলার কথা ছাড়িয়া এখন সাধুদিগের আবাস ও উপজীবিকার কথা বলিব। সাধুদিগের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা খুব ধনী মহান্ত; এমন লোক আছেন, বড় বড় ধনী ও রাজগণ যাঁহাদের করতলস্থ; কিন্তু অধিকাংশ সাধুই নিঃসম্বল অযাচক, ইহাঁদের কিছুই সঞ্চয় নাই, কোথা হইতেও কিছু আসিবার সম্ভাবনা নাই, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আকাশ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছেন। অনেকের কোন কোন দিন বা অনাহারে যাইতেছে কিন্তু আহারের জন্য কোন চেষ্টা নাই। গৃহস্থেরা সাধু ভোজনের জন্য নানাবিধ সামগ্রী পাঠাইতেছেন, যাঁহার আসনে যেরূপ পড়িতেছে, তিনি তেমনি পাইতেছেন। কখন কখন মহান্তগণও ভোজন করাইতেছেন, কোন কোন সাধুর আশ্রমে নিরন্তর সদাব্রত চলিতেছে। প্রতিদিন কত হাজার টাকার ধুনির কাঠ পুড়িয়াছে, বলিতে পারি না, ইহাও গৃহীরা যোগাইয়াছেন। অধিকাংশ সাধুই এক একটী ছাতার নীচে একখানা চাটাই বা কম্বলাসনে থাকেন। কেহ কেহ ছাতা, কম্বল বা গাত্রাবরণ কিছুই ব্যবহার করেন না, যতদূর লোকাপেক্ষা না হইয়া থাকিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করেন। পাঠকগণ, এইরূপ বেশভূষা সম্বল সম্পত্তিযুক্ত হাজার হাজার লোকের একত্র সমাবেশ চিন্তা করুন।

সাধুদিগের মধ্যে তিন সম্প্রদায় প্রধান ছিলেন, সন্ন্যাসী, নানকসাহী ও বৈষ্ণব। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে দশনামা, দণ্ডী, পরমহংস ও শাক্ত প্রভৃতি শাখা এবং শাক্তের অন্তঃর্গত ভৈরবী ও আলেক প্রভৃতি উপশাখা ছিল। নানকসাহী দিগের প্রধান শাখা দুইটী, উদাসী ও নির্ম্মলা। গুরু নানকের পুত্র শ্রীচাঁদের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়

উদাসী এবং দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম নির্ম্মলা। এতদ্ভিন্ন নানকসাহী সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মহা· পুরুষের প্রবর্ত্তিত দাদুপন্থী, গরিব দাসী, বেহার বৃন্দাবন প্রভৃতি নানাশাখা ছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানতঃ চারি শ্রেণী ছিল। রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, শ্রী ও নিম্বাদিত্য। এতদ্ভিন্ন কবীরপন্থী, গোরখনাথী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী, নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং শাখা সম্প্রদায় ছিল। সন্ন্যাসীরা মেলার উত্তরদিক, বৈষ্ণবেরা দক্ষিণদিক, এবং নানকসাহীরা মধ্যস্থল অধিকার করিয়াছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায় ও শাখা ইহাদিগেরই নিকটে নিকটে ছিলেন। ভৈরবীগণ বিশেষ পরীক্ষিতচরিত্র মহাত্মাগণের সন্নিকটে তাঁহাদের চক্ষের উপরে ছিলেন। ইহা- দিগের কোন বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য মহাত্মারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ছেন। শুনিয়াছি অনেক দুশ্চরিত্র চোর ও বদমায়েসগণ সাধু সাজিয়া গোলে হরিবোল দিয়া মেলায় প্রবেশ করিয়াছিল কিন্তু সাধুরা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। বাহিরের কথা এইপর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া ভগবানের কৃপায় যে কয়েকটী সাধুর বিষয় যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহাই বর্ণনা করিব এবং সেই সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে কুম্ভমেলায় যাহা কিছু দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহার কথঞ্চিৎ বলিব।

সাধু-দর্শন।

—:০:—

নানকসাহী।

মহাত্মা করণ দাস—দেখিলাম, একটী আশ্রমের বাহিরে প্রকাণ্ড প্রান্তরে প্রায় সহস্র দীন দুঃখী লোক আহারে বসিয়াছে। আমরা আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইলে একটী পলিতশ্মশ্রু দিব্যকান্তি বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক অতি বিনয়ের সহিত যোড়হস্তে অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রমের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এই আশ্রমের মহান্তের নাম করণ দাস। ইনি নানক-সাহী শিখ। যাঁহার আশ্রমে প্রতিদিন সহস্র কি সহস্রাধিক দীন দুঃখী এবং সাধুসজ্জন লুচি, মালপুয়া ও অন্ন প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে দেখিতে সহজেই আমাদের কৌতুহল জন্মিল। কেহ ভাবিতে পারেন হয়ত তিনি কত বহুমূল্য আসনে কিঙ্কর-সেবিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন সাধুটী যখন আমাদিগকে করণ দাসের তৃণ-কুটীরে লইয়া গেলেন, তখন দেখিলাম, দীর্ঘপাড় বিশিষ্ট এক হস্ত পরিসর একখানা সামান্য ধুতী পরিয়া করণ দাস মহাশয় অতি সাধারণ ভাবে বসিয়া আছেন। আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কোথায় আমাদের বাড়ী, কোথা হইতে আসিয়াছি, মেলায় কোথায় রহিয়াছি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিলেন। কতকালের পরিচিত বান্ধবের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। মানুষের প্রতি কি অপূর্ব্ব নির্ম্মল সরল স্বাভাবিক প্রেম! তাহাতে বাহ্চাক্‌চিক্য বা কৃত্রিমতা কিছুইনাই। কাছে বসিলে আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণটী ছুটিয়া গিয়া যেন সেই মহাপ্রাণ মহাত্মগণের প্রাণে মিলিয়া যায়! তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া আর 'পর' হইয়া থাকা যায় না, কেমন যে একটা স্বাভাবিক স্নেহ আসিয়া হৃদয়কে শীতল করে, তাহা সম্ভোগ না করিলে অনুমানে বুঝা যায় না। এক দণ্ডের সাক্ষাতে তাঁহাদিগকে যেন কত কালের আত্মীয় বলিয়া মনে হয় এবং প্রাণের কোন কথা বলিয়া ফেলিতে সঙ্কোচ হয় না। বস্তুতঃ সংসারের কৃত্রিম হাবভাবের মধ্যে প্রকৃত সাধুসঙ্গ যে আমাদিগেকে কি এক নূতন বস্তু দেখাইয়া দেয়, প্রাণের কাছে কি এক অকৃত্রিম স্বর্গশোভা খুলিয়া দেয় যে ব্যক্তি তাহা জানে নাই, একবারও অনুভব করে নাই, সে জগতের প্রধান সুখেই বঞ্চিত রহিয়াছে। মহাত্মা করণ দাস ইঙ্গিতে আমাদিগকে তাঁহার আপন করিয়া ফেলিলেন, আমরা বিনম্র সন্তানের ন্যায় তাঁহার কাছে বসিলাম। তিনি আমাদের জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আমরা দর্শন করিতে বাহির হইয়াছি, এসময়ে বিলম্ব করিতে ইচ্ছা নাই। তখন আমাদের ইচ্ছার প্রতিরোধ না করিয়া, মা যেমন বিদেশ-গামী সন্তানের হাতে সযত্নে মিষ্টান্ন তুলিয়া দেন, তেমনি ঠোঙ্গায় করিয়া আমাদের হাতে যথেষ্ট খাবার দিয়া দিলেন। আমরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম, তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

পণ্ডিত কেশবানন্দ—মহাত্মা করণদাসের আশ্রম হইতে বাহির হইয়া অপর একটা আশ্রমে গেলাম, তখন

সেখানেও সাধুদের ভোজন হইতেছিল। আমরা একটা বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইলাম, সাধুরা আমাদের কাছে আসিয়া আমাদিগকে আহারের জন্য বড়ই অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা কোন ক্রমেই সম্মত হইলাম না, তখন তাঁহারা কিছু কিছু মিষ্টান্ন আমাদের হাতে দিয়া গেলেন। ইহাঁরাও নানক-সাহী। এ আশ্রমের মহান্তের নামটী আমার মনে নাই। কিছুদূর যাইয়া আমরা পণ্ডিত কেশবানন্দের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ইনিও নানকসাহী এবং অসাধারণ পণ্ডিত। পঞ্জাব প্রদেশের যত বড় বড় রাজা সকলেরই নিকট ইহাঁর অপ্রতিহত প্রভাব। কেশবানন্দ খুব মহৎ লোক, কিন্তু তাঁহার বেশভূষা অন্যান্য সাধুদের মতন নহে। আমরা যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তখন তাঁহার পরিধানে ধুতী ও গাত্রে জরীর কাজ করা মকমলের অঙ্গাবরণ, বসিবার আসনাদি ও গৃহসজ্জা প্রভৃতি ধনীজনের উপযোগী। তাঁহার আশ্রম ৭।৮টী উৎকৃষ্ট তাঁবুতে নির্ম্মিত। এখানেও অনেক লোক অন্ন প্রাপ্ত হয়। কেশবানন্দের মূর্ত্তি গম্ভীর ও জ্ঞান-ব্যঞ্জক। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অন্যত্র চলিলাম।

মহাত্মা দয়াল দাস—মহাত্মা দয়াল দাসও শিক সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত। কিন্তু ইনি খাঁটি নানকপন্থী নহেন। প্রায় দুই শত বৎসর গত হইল নানকপন্থীদিগের মধ্যে গরীব দাস নামক এক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি এক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন, তাহার নাম গরীবদাসী সম্প্রদায়। পঞ্জাব প্রদেশে বহু লোক এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। মহাত্মা দয়াল দাস এই গরীবদাসী সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তি।

প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় দয়াল দাসেরই মন্ত্র-শিষ্য। এই আশ্রমে আমরা স্নানাহার করিলাম। দয়াল দাসের আশ্রমে যাহা দেখিলাম তাহা অতি অদ্ভুত। আজানু-লম্বিত-হস্ত, সুদীর্ঘকায়, গৈরিকধারী দয়ালদাসকে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা দয়াল দাস কতকালের আত্মীয়ের ন্যায়, যে কয়েক দিন কুম্ভমেলায় থাকিব, আমাকে তাঁহার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিছু কিছু উপদেশ শুনিলাম। গরীব দাসের যে সমস্ত উপদেশ আছে, সে সমস্ত অতিশয় দুর্লভ। সেই সমস্তের যদি বাঙ্গালায় অনুবাদ হয়, তবে তাহা দেশের একটী বিশেষ সম্পত্তি হইবে। দয়াল-দাস মহাশয়ের এক শিষ্যকে দেখিলাম, তিনি মাঘ মাসের আরম্ভ হইতে কিছুই আহার করেন নাই, আমি যেদিন তাঁহাকে দেখিলাম সেদিন ২৪শে মাঘ। তিনি অতি বিনম্র-ভাবে আমাদিগকে কিছু কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। শেষ কথা দয়াল দাসের সদাব্রত। দয়াল দাসের সদাব্রত কুম্ভমেলার একটী বিশেষ বিষয়। প্রয়াগে দুঃখী দরিদ্রের অন্ত নাই, কত লোক যে অনাহারে দিন কাটায়, তাহার খবর কে রাখে? দয়াল দাসের আশ্রম-দ্বার একমাস কাল তাহাদের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। অন্যান্য আশ্রমে কর্ত্তৃপক্ষের সাধু সেবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে, তাহার পরে কাঙ্গাল ভোজন। কিন্তু দয়াল দাসের সাধু কাঙ্গাল সকলই সমান। একদিন এক জন বলিয়াছিলেন যে, আপনার সাধু ভোজন অপেক্ষাও কাঙ্গাল ভোজনের দিকে অধিক দৃষ্টি, ইহার কারণ কি? তাহাতে দয়ালদাস উত্তর

করিলেন, "সকলেরই এক এক প্রাপ্য অধিকার আছে। রাজার প্রাপ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা, সাধুর প্রাপ্য অভিবাদন ইত্যাদি, সেইরূপ অন্ন কেবল ক্ষুধিত ব্যক্তিরই প্রাপ্য, তাহাতে সাধু অসাধু বিচার কি? যদি পরিচ্ছদের মান মর্য্যাদা ধর, তবে গৈরিকধারী সন্ন্যাসিদিগকে ভোজন করাইলে যদি সাধু ভোজনের ফল হয়, তবে বস্ত্রাভাবে নগ্নপ্রায় এই সমস্ত কাঙ্গালদিগকে ভোজন করাইলে মহাদেব ভোজনের ফল হয়।" মহাত্মা দয়াল দাসের সদাব্রত কি মহান্ ভাবব্যঞ্জক! দয়াল দাসের কোথাও কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম নাই। তিনি বারমাস দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান এবং যখন যেখানে থাকেন, সেই খানেই প্রতিদিন হাজার হাজার লোক তাঁহার অতিথি। কোন নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর তাঁহার নির্ভর নাই। শিলা-বৃষ্টির ন্যায় চারিদিক হইতে টাকা ছুটিয়া আসে, এক জন আসিয়া টাকা ঢালিয়া দিল, এক শিষ্য কুড়াইয়া নিয়া গেলেন এবং আর একজন খরচ করিয়া ফেলিলেন। "অর্থাপাদরজোপমা" এ কথা ইহাঁদের আচরণে প্রত্যক্ষ হয়। সংসারীর সাধ্য নাই, এভাবে অর্থ ব্যয় করে। ইহাঁদের ব্যবহার দেখিলে ঘোর সংসারা-শক্তেরও সংসার বন্ধন পলকের তরে ছিন্ন হইয়া যায়। মহাত্মা দয়াল দাস বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভাল বাসেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় মেলাস্থলে মাঝে মাঝেই বক্তৃতা করিতেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীয় লোকদিগের কীর্ত্তন তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। আমাদের কাছে সে কথা তিনি বলিয়াছিলেন। দয়াল দাস দয়ার সাগর ভক্ত-প্রেমিক, তিনি প্রেমহীন কর্ম্মী নহেন বা কর্ম্মহীন সন্ন্যাসী নহেন।

মহাত্মা নানকসাহী রঙ্গিন বাবা।—ইহাঁর নামটী জানিতে পারি নাই, ইনি নানকসাহী "উদাসী" দলভুক্ত, নানা-রঙ্গের কাপড়ের টুক্‌রা জড়াইয়া ইনি পরিচ্ছদ করিয়াছেন। এলাহাবাদ কেল্লার নিকটে সুরদাসের আশ্রমে ইনি থাকেন। যখন নানকসাহীরা সাজ সজ্জা করিয়া স্নানে চলিলেন, হস্তিপৃষ্ঠে বহুমূল্য ঝালর সকল ঝুলিল, সুবর্ণখচিত মকমল পতাকারাজি আকাশমার্গে উড্ডীন্ হইল এবং ডঙ্কাদির তুমুল ধ্বনিতে কিছু কালের জন্য সেই উদাসিনিবাস রাজপুত্রের বিবাহোৎসব-বাটিকার বিভ্রম জন্মাইল, সেই সময়ে এই বাবাজী ছুটাছুটী করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়, এই কি উদাসীনতা? ইহারই নাম কি বৈরাগ্য? গুরু নানক কি এইরূপ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন? ইহারা যে মায়ার গোলাম" ইত্যাদি।

মেলাতে নানকসাহীদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জাঁক জমক ছিল। ব্যক্তিবিশেষের বিলাসিতার জন্য এরূপ হয় নাই কিন্তু বহুমূল্য নিশান ও হস্তী প্রভৃতি স্নানের সময়ে সঙ্গে লইয়া, মহান্তকে রাজার ন্যায় সাজাইয়া নেওয়া ইহাঁদের প্রথা দাঁড়াইয়াছে। আবার ইহাঁদের মধ্যে আর একটী বিষয়ও দেখিলাম। রাত্রিতে স্ত্রীলোকে সঙ্গীত গায়, সমস্ত উদাসী ও গৃহী নানকসাহীরা একত্র হইয়া শ্রবণ করেন। উহা ধর্ম্মসঙ্গীত, এবং গায়িকারা আমাদের দেশীয় কীর্ত্তনওয়ালীশ্রেণীর স্ত্রীলোক। আমরা একদিন এই সঙ্গীত শুনিলাম, মন্দ লাগিল না। রঙ্গিন বাবা প্রকৃত উদাসী, তাঁহার এসব ভাল লাগে না, বস্তুতঃ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক জাঁক-জমক কি স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গীত প্রকৃত সাধুরা বড় পছন্দ করেন না।

সন্ন্যাসী।

মহাত্মা ভোলাগিরি।—ইনি দণ্ডীসন্ন্যাসী। মেলার মধ্যে ইনি একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। কে কতবড় লোক তাহা কুম্ভমেলায় গেলে কিঞ্চিৎ বুঝা যায়। যে সকল লোককে রাস্তা ঘাটে গায়ে ছাই মাখিয়া অতি সাধারণ ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, যাহা দিগকে নিরবচ্ছিন্ন ব্যবসায়ী সাধু বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, তাহাদের মধ্যে অথবা ঐরূপ বেশে ও ভাবে সময়ে সময়ে এমন মহাত্মাও থাকেন সাধুরা যাহাদিগকে মহাপুরুষ বলিয়া পূজা করেন। মহাত্মা ভোলাগিরিকে কলিকাতায় যাঁহারা কখন কোন ঘাটে কি কখনও কোন আস্তবলের কাছে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন কুম্ভমেলায় তাঁহার প্রভাব দেখিলে তাঁহারা অবাক্ হইয়া যাইতেন। বহুমূল্য বস্ত্রাবাস-রাজিতে ইহাঁর আশ্রম সুশোভিত। অর্দ্ধহস্ত উচ্চ মকমল গদিতে বসিবার স্থান। কত শত শত লোক নিরন্তর আহার পাই-তেছে, সমারোহের সীমা নাই। স্নানের দিনে সন্ন্যাসী দল ইহাঁকে স্বুবর্ণ-খচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরাইয়া, বিচিত্র-সাজে সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া ইঁহারই অনুগমন করিয়াছিলেন। ইঁহার এক শিষ্যের নাম পরমানন্দ গিরি। তিনিও অসাধারণ ব্যক্তি। সন্ন্যাসীর এরূপ সাজ সজ্জা ও ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া হয়ত কেহ বিরক্ত হইতে পারেন সেই জন্য ব্যাপারটা

পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। বড় বড় রাজা এবং জমিদারগণ ইঁহাদিগের সেবার জন্য এই সমস্ত রাজযোগ্য বস্তু প্রদান করেন। কিন্তু সে সমস্ত ব্যবহারের দিকে ইহাঁদের একেবারেই মনোযোগ নাই। ইহাঁরা প্রায় সর্ব্বদাই কৌপিন বহির্ব্বাস মাত্র পরিয়া সামান্য আসনে উপবেশন ও সামান্য ভাবে জীবন যাপন করেন। স্নান প্রভৃতির সময় সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে সাজসজ্জা গ্রহণ করেন। এক দিন ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় সাধুদের বড়ই ক্লেশ হইয়াছিল, পরদিন এই সকল মহাত্মা কৌপিন মাত্র পরিয়া বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা হইয়া সমস্ত মেলায় সকল সাধুগণের কি কি অসুবিধা ঘটিয়াছে তাহারই তত্ত্ব করিয়া বেড়াইয়াছেন। তখনকার দীন হীন অমায়িক ভাব অতি আশ্চর্য্য। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই সকল সাধুরা বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়া ও সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে চলিয়া যাইতেছেন। ভোলাগিরির শিষ্য পরমানন্দগিরি অনেক সময় সমাগত যাত্রিদিগকে অতি মধুর উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন "দেখ তোমরা তীর্থে আসিয়া এক একটী খাদ্য ফল ত্যাগ করিয়া যাইতেছ কিন্তু ইহাতে বিশেষ উপকার কিছুই নাই। তোমরা যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, পরনিন্দা মিথ্যাকথা ইহারই এক একটি পরিত্যাগ করিতে পার, আর সর্ব্বদা মনে রাখিতে পার আমি এ বৎসর প্রয়াগ যাইয়া অমুক পাপকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা হইলেই প্রকৃত কল্যাণ হয়, তীর্থ ভ্রমণের ফল হয়," ইত্যাদি। ইহাঁদের আতিথ্য অতি চমৎকার, লোককে খাওয়াইতে কতই ব্যস্ত এবং কতই আনন্দিত!

মহাত্মা অমরানন্দ স্বামী।—দাক্ষিণাত্য নাসিকে ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রম। ইনি একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি। সন্ন্যাসিদিগের মধ্যে অনেকেই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু এই স্বামীজী চৈতন্য-ধর্ম্ম সবিশেষ জানেন। ইনি পাঠ্যাবস্থায় ন্যায়-শাস্ত্র পড়িতে নবদ্বীপধামে ছিলেন, সেখানে থাকিয়াই ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। ইনি বলিলেন "গৌরাঙ্গ যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই ঠিক। শঙ্করের অভিপ্রায় ও ঐরূপই ছিল, কেবল না বুঝিয়া গোল হইয়াছে।" মহাত্মা অমরানন্দ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

মহাত্মা মৌনী বাবা।—অনন্তাশ্রমে মৌনী বাবা ছিলেন। অনন্তাশ্রম সন্ন্যাসিনিবাসেরই এক অংশে। ইনি দেখিতে ভোলানাথ পুরুষ। স্থূলকায়, মুণ্ডিত মস্তক, কৌপিন মাত্র পরিহিত। এক খানা লম্বা কুটীরের এক প্রান্তে আপনার মনে আপনি বসিয়া আছেন। ইহাঁকে দেখিলে ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে মনে পড়ে। শুনিলাম ইনি অসাধারণ ব্যক্তি। সন্ন্যাসীরা অনেকে শুষ্কজ্ঞানানুরাগী, কিন্তু ইনি সেরূপ নহেন। যদিও কথা না বলায় ইঁহার মতামত কিছু জানা যায় না কিন্তু একদিন এক স্থানে কীর্ত্তন শুনিয়া ইহাঁর সমস্ত শরীর এরূপ কম্পিত হইতে লাগিল যে সকলেই তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেন।

মহাত্মা কেশবানন্দ স্বামী।—সন্ন্যাসিদলে ইনিই একমাত্র বাঙ্গালী ছিলেন। কলিকাতার সন্নিকটে ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রম ছিল। ইনিও সাধু মহলে এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কেশবা-

নন্দ অনেক কঠিন রোগের ঔষধ জানেন, এজন্য অনেক বড় বড় ধনী লোক ইহাঁর বশীভূত। ইনি রোগ আরাম করিয়া অর্থ গ্রহণ করেন, এরূপে ইহাঁর প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হয় কিন্তু তাহা দ্বারা নিজের সুখভোগের কোন বন্দোবস্ত করেন না, কেবল সাধু সেবায়ই সেই সকল অর্থ ব্যয় করেন। ইহাঁর আতিথ্য অতিশয় প্রসিদ্ধ, মেলাতে বহু লোক ইহাঁর আশ্রমে অন্ন লাভ করিয়াছে। ইহাঁর প্রকৃতিও অতিশয় মহান্।

মহাত্মা নেঙ্গা বাবা।—এলাহাবাদ দুর্গের নিম্নে একটী বটবৃক্ষতলে ইহাঁর আশ্রম। ইহাঁকে নেঙ্গাপরমহংস বলে। হরিনাম, কৃষ্ণনাম বলিতে ইহাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ইহাঁর উদারতাও অতি আশ্চর্য্য। দাদুপন্থীরা কোন শাস্ত্র মানেন না, এজন্য শাস্ত্রমুখী হিন্দুগণের তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকারই কথা। একদিন একজন দাদুপন্থী নেঙ্গা বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলে তিনি উপস্থিত অন্যান্য সকলকে বলিলেন "যাহার বড় ভাগ্য সেই দাদুপন্থী হইতে পারে কারণ ইহাঁরা কেবল নিষ্ঠার সহিত গুরু বাক্য মানিয়া চলেন। তিলক মালা, ভেক নিয়া অনেকে মনে করেন সাধু হইয়াছি। কিন্তু দাদুপন্থীদিগের দৃষ্টি অন্তর শুদ্ধির দিকে"। আরও বলিলেন যে "শাস্ত্র আর পন্থা ইহার একটী ধরিয়া চলিলেই হয়। শাস্ত্র ঋষি-বাক্য, পন্থা কোন সিদ্ধপুরুষ-প্রদর্শিত পথ, তাহাতে চলিলেও স্থানে পৌছান যাইবে"। আমরা সচরাচর দেখি আমাদিগের মধ্যে গৃহেই হউক বা সভাস্থলেই হউক, বিরুদ্ধমতাবলম্বী দুজন লোকের একত্র মিলন হইলে তাঁহাদের আলোচনার পরিণাম প্রায়শঃই তিক্ত হয়, কিন্তু সাধুদিগের প্রণালী ভিন্ন। বিরুদ্ধ

মতাবলম্বীদিগের মধ্যে দোষ গুণ উভয়ই আছে, আমাদের দৃষ্টি দোষের দিকেই আগে ছুটে সুতরাং আমরা গুণ ফেলিয়া দোষেরই আলোচনা করি, সাধুদিগের চক্ষু আগেই পরস্পরের গুণ দেখে কাজেই তাঁহাদের আলাপের পরিণাম মিষ্ট হয়।

নেঙ্গা বাবার দীনহীনতা ও প্রচুর। তিনি বলেন "আমি প্রয়াগ রাজের দ্বারবান, আমাকে না দেখা দিয়া কেহ রাজ বাটীতে প্রবেশ করিতে পারেন না।"

বৈষ্ণব।

মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা —ইনি বৃন্দাবনের চৌরাশী ক্রোশের মহান্ত। সাধুরা ইহাকে ব্রজবিদেহী বলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইনি দেহে থাকিয়াই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। বৃন্দাবনের লোকেরা এবং অন্যান্য সাধুবর্গ ইহাঁকে জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ বলিয়া জানেন। সুগঠিত অটুট শরীর বার্দ্ধক্যকে উপেক্ষা করিয়া আপনার যৌবন-পুণ্যের উজ্জল প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। সুপক্ক কেশরাশি গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, একটী বৃহৎ ছত্রের নীচে অতি সামান্য কম্বলাসনে বিভুতি-ভূষিত হইয়া বসিয়া আছেন। শারীরিক গঠন, দৃষ্টি, উপবেশন সমস্তই অতিশয় দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। পরিধানে মাত্র একটী কাঠের কৌপীন। কাঠের কৌপীন পরেন বলিয়াই ইহাঁদিগকে কাঠিয়া বাবা বলে। তিনি যে কত বড় একজন প্রভাবশালী লোক, কত লক্ষ লক্ষ লোক যে তাঁহার আজ্ঞাধীন,

কত রাজা মহারাজা যে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া আপনা-দিগকে কৃতার্থ মনে করিতে চান, তাহা বাহির দেখিয়া কিছুই জানিবার উপায় নাই। যেরূপ শত শত সন্ন্যাসীকে বঙ্গদেশের গৃহস্থেরা অনাদরবাক্যে গৃহদ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়, ব্রজবিদেহী কাঠিয়া বাবার বেশভূষায় তাহাদের হইতে কোন পার্থক্য নাই। এক সময় গোয়ালিয়ারের মহারাজ ইহাঁর নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "আমি মহারাজজীর কি সেবা করিতে পারি ?" তাহাতে রামদাস বলিলেন, "বাবা, আমার কোন সেবা নাই, তুমি আনন্দে থাক।" ইনি অনাসক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ। একটী শিষ্য নিকটে পায়ের কাছে বসিয়া গুরুদত্ত নাম জপ করিতেছে, আর অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। এত লোকসমারোহ, কথোপকথন, গোলমাল, কিন্তু তাহার কোন দিকেই ইহাঁর দৃষ্টি নাই। পতি-বিয়োগ-বিধুরা সতীর ন্যায় কি রত্নলাভের আশায় যে তিনি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা অন্যে কি বুঝিবে? মনে হয় সেই হারাধন লাভ না করিয়া তিনি বুঝি আর সংসারের কোলা-হল শুনিবেন না। চঞ্চলচিত্ত আমরা একনিষ্ঠতা কিরূপ জানিলাম না, অনুরাগের কথা শুনিলাম কিন্তু অনুরাগ কি বুঝিলাম না, এইরূপ আশাবদ্ধ উৎকণ্ঠিত সাধকের দর্শন আমাদের পক্ষে মহাপুণ্য। কাঠিয়া বাবা জ্ঞানপ্রেমের মূর্ত্তি, শুনিয়াছি যে তাঁহার নিকট দু-দিন থাকে, সেই তাঁহার হইয়া যায়। এই মেলাতে বৈষ্ণবদল তাঁহাকেই অগ্রণী করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মেলাবসানে তিনি নিজ আশ্রম বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তাঁহার আশ্রম রাধাকুণ্ডে।

মহাত্মা নরসিংহ দাস বা পাহাড়ী বাবা।—হিমালয়ের বরফাবৃত প্রদেশে ইহাঁর তপস্যাস্থান। ঐ প্রদেশকে সাধুরা বরফাণ বলেন। তথায় বহু দূরে দূরে এক একটী গহ্বরে এক এক জন সাধু থাকেন; একের সহিত অন্যের সাক্ষাৎ হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কন্দমূলই সেখানে ইহাঁদিগের উপজীবিকা।

মহাত্মা নরসিংহ দাস জটাশ্মশ্রু-ধারী। ইনি কৌপীন পরিধান করেন এবং কটিদেশে রাশিকৃত ডুরি বাঁধেন, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেন, কথন কথন গাত্রে কম্বলও ব্যবহার করেন। শেষ রাত্রে স্নান করিয়া আপনার ক্রিয়া করিতে বসেন। ইনি অধিকাংশ সময়ই নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করেন। বাবাজী অত্যন্ত অল্পভাষী; কিন্তু যখন কথা বলেন তখন তাহা এমনই মিষ্ট লাগে যে সেই এক কথাই বারবার শুনিতে ইচ্ছা হয়। ইহাঁর সারল্যমাখা বালস্বভাব এবং সুধামাখা মধুর হাস্য অপার্থিব বস্তু। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ইনি বালকের মতন খাবার চান, তাহাতে কোন সঙ্কোচ নাই। কাহাকেও কিছু করিতে বলিতেও সঙ্কোচ নাই। খাওয়া দাওয়ার কথায় তিনি বলিতেন, ভগবান যখন যে ভাবে রাখিবেন তাহাতেই তুষ্ট থাকিতে হইবে। তিনি যে কেবল সুখেই রাখিবেন এমন কোন কথা নাই। বাবাজী এই ভাবটী আবার কবিতায় প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "কভি ঘি-ঘনা, কভি মুটিভর্ চানা, কভি চানা ভি মানা"। কখনও ঘৃতপক্ক নানাবিধ খাদ্য, কখনও এক মুষ্টি ছোলা মাত্র, কখনও সে ছোলা মুষ্টিও জুটে না। সাধুরা এই ভাবেই জীবন কাটান। যিনি লুচি মণ্ডা ও উপবাসকে সমান আদরে প্রভুর দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত।

মহাত্মা নরসিংহ দাস "তুহি মেরা প্রাণ" বলিয়া যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন সেই কৃতার্থ হইত। একদিন কয়েকটী ব্রজবাসীর সহিত বাবাজীর বড় ঝগড়া বাধিয়া গেল। ব্রজবাসীরা পাহাড়ী বাবার প্রভাব কিছুই না জানিয়া তাঁহাকে সামান্য লোক জ্ঞানে অনেক কটু কথা বলিলেন। "তোমার মতন সাধু ঢের দেখিয়াছি, অমন জটা ধরা, ছাই মাথা, আমাদের ঢের জানা আছে, আমরা ব্রজবাসী, আমরা বাক্‌সিদ্ধ, সাধুর গৌরব আমাদের কাছে কি?" ইত্যাদি ঢের কথা তীব্রভাবে বাবাজীকে বলা হইল। বাবাজীও "হাম দেখতা হ্যায় তোম্‌লোগ্‌ কুস্‌ নেহি হ্যায়" ইত্যাদি বলিলেন। তাহাতে ব্রজবাসীরা আরও চটিয়া গেল। বাবাজী তাহাদিগকে ভাল মন্দ না বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। কি আশ্চর্য্য শক্তিতে ব্রজবাসিদিগের প্রদীপ্ত অভিমান একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইলাম যে তখনই সেই ব্রজবাসিদের মধ্যে যিনি বিশেষ কটু বলিতেছিলেন, তিনি প্রথম হাতযোড় করিয়া তাহার পর বাবাজীর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কি শক্তিতে যে হঠাৎ এই কার্য্যটী করাইল, তাহা বাহির হইতে বড় বুঝা যায় না। ব্রজবাসীদের পক্ষে কাহারও পায়ে পড়া বড় সোজা কথা নহে।

বাবাজী কেমন সরল একটী কথায়ই বুঝা যাইবে। একদিন আমাদের কোন বন্ধু কোন একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এ আশ্চর্য্য কার্য্য আপনি কি রূপে করিলেন? বাবাজী বলিলেন "আমিত সিদ্ধ পুরুষ, আমি ইহা করিতে পারি।" সাধু চরিত্র না জানিলে মনে হয় এরূপ বলা বড়ই দাম্ভিকতা।

বাবাজীর মুখে অনেক সময়ই কয়েকটী কথা শুনা যাইত যথা; "আনন্দং পরমানন্দং, পরমানন্দং পরম-সুখং, পরম-সুখং পরমা তৃপ্তিঃ, পরমা তৃপ্তিঃ, পরমা শান্তিঃ, পরমা শান্তিঃ, পরমা গতিঃ" আর বলিতেন "সৎসঙ্গঃ পরমা সম্পদ্"। বাবাজী নিজে সর্ব্বদাই পরমানন্দে থাকেন এবং সৎসঙ্গ যে পরম সম্পৎ তাহাও তাঁহার সঙ্গলাভে অনুভূত হয়।

মহাত্মা ভিখন দাস!—মহাত্মা ভিখম দাসের আশ্রম বাঁকিপুরে। মেলাস্থলে ইনি ও অবাধ-সদাব্রত খুলিয়াছিলেন। অনেক সাধু সজ্জন ও দীন দুঃখীকে ইহাঁর আশ্রম হইতে অন্ন দেওয়া হইয়াছে। ভিখন দাস যে কেবল মেলায় আসিয়া এইরূপ অতিথিসৎকার করিতেন তাহা নহে, ইহাঁর আশ্রমে বারমাসই সদাব্রত চলিতেছে। আরাধ্য দেবতার প্রতি ইহাঁর আশ্চর্য্য নির্ভর। কোথা ও হইতে এক পয়সা আসার আশাভরসা কি সম্ভাবনা নাই এবং কাহার ও নিকট কিছু প্রার্থনা নাই; সঞ্চয় ত কিছুই নাই, কিন্তু বাবাজীর আশ্রম হইতে অতিথি কখনই বিমুখ হইয়া যায় না। তাঁহার অতিথি-সৎকারের প্রণালী এই, যে বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তণ্ডুল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘৃতাদি দ্বারা অতিথির সেবা হইবে। একদিন রাত্রিতে তাঁহার আশ্রমে একদল সাধু আসিয়া অতিথি হইলেন। দলটীতে প্রায় তিনশত মূর্ত্তি। ভিখন দাসের ভাণ্ডারে কিছুই নাই, হস্ত কপর্দ্দক-শূন্য। সাধুদল দুদিন পর্য্যন্ত উপবাসী, বাবাজীর মানসিক অবস্থা পাঠক একবার চিন্তা করুন। তিনি একান্ত অনন্যোপায় হইয়া আরাধ্য দেবতা রাম-সীতার মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক সটান শুইয়া পড়িলেন। আর কাহার কাছে যাইবেন, এসঙ্কটে কে

উদ্ধার করিবে? একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন বাবাজীর ত আর আশ্রয় নাই। সেই অগতির গতি, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুই ভক্তের একমাত্র আশাভরসা। সজলনয়নে ভিখন দাস প্রার্থনা করিলেন "প্রভো, আমারত কেউ নাই, আমিত আর কাহার ও কাছে প্রার্থনা করিনা। দুই দিবসের অনাহারী সাধুদল উপস্থিত, এখন আমার আশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা কর"। ভিখনদাস যখন এই ভাবে আরাধ্য দেবতার চরণে পড়িয়া আছেন, এমন সময় কে আসিয়া মন্দিরেয় দ্বারে আঘাত করিল। বাবাজী ফিরিয়া চাহিলে সে ব্যক্তি বলিল "আমরা কোন কার্য্যে জয়লাভের জন্য সীতারামকে মানত করিয়াছিলাম, সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং সীতা-রামের জন্য আমরা অমুক মহাজনের নিকট দুইশত টাকা রাখিয়া দিয়াছি, আপনি উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি আপনাকে সেই টাকা দিবেন।" ভিখন দাস শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া সেই মহাজনের নিকট হইতে টাকা লইয়া আসিলেন এবং মহা-সমারোহে অতিথিসৎকার হইয়া গেল। এই ঘটনা বাঁকিপুরের অনেক লোকই অবগত আছেন। ভিখনদাস একজন বিশ্বাসী বৈষ্ণব, তাঁহার ভক্তি বিনয়, সদাশয়তা ও নির্ভরশীলতা অতি আশ্চর্য্য।

মহাত্মা গম্ভীরনাথ।—ইনি নাথ যোগী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গয়াতে কপিলধারার নিকট ইহাঁর আশ্রম ছিল। এখন ইনি কোথায় থাকেন ঠিক জানি না। ইহাঁর বিষয় বিশেষ বর্ণনা করার কিছু নাই। যেরূপ তাকাইয়া, একটু মাথা নাড়িয়া ইনি প্রাণ ভিজাইয়া দেন, ভাষায় তাহার বর্ণনা হয় না। ইনি অত্যন্ত অল্পভাষী। সাধুরা ইহাঁকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানেন।

বহু শিষ্য সঙ্গে মেলাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এক দিন একজন ধনী ইহাঁর আসনের নিকটে পাঁচশতখণ্ড কম্বল রাখিয়া যান। গম্ভীরনাথ ধ্যানস্থ ছিলেন, কিছু পরে নেত্র উন্মিলিত করিয়া দেখিলেন রাশিকৃত কম্বল। বাঁ হাতের অঙ্গুলীদ্বয় ঈষৎ নাড়িয়া বলিলেন যাহাদের দরকার আছে তাহাদিগকে এ সকল দিয়া দাও, তখনই সমস্ত দান হইয়া গেল।

মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা।—দুঃখের বিষয় এই মহাত্মার নামটী জানিতে পারি নাই। ইনিও কাঠের কৌপীনধারী, সুতরাং কাঠিয়া বাবা। ইহাঁর আনন্দমূর্ত্তিটি মনে করিয়া এখন ও যেন প্রাণ শীতল হয়। কুম্ভমেলায় তিন ব্যক্তির হাসি দেখিয়াছি, যেরূপ হাসি মানুষের হাসি বলিয়া মনে হয়না। সেই তিন জনের মধ্যে এই মহাত্মা একজন। ইহাঁর সঙ্গে আমাদের অনেক দেখা শুনা হইয়াছে। যখনই ইনি আমাদের মধ্যে ইহাঁর সদানন্দ মূর্ত্তিখানি প্রকাশ করিয়াছেন থনই চারিদিকে যেন একটা আনন্দময় ভাব উথলিয়া উঠিয়াছে। সে মূর্ত্তি কখনই সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার অতীত অপার্থিব মধুময় সেই ঈষৎ হাস্যকে পরিত্যাগ করে না। কথা না কহিলেই বা কি, দেখিয়াই যে তৃপ্তি! যখন একটু একটু মাথা নাড়িয়া মধুর দৃষ্টিতে কথা বলেন, তখন ভাষা যেন বালক-কণ্ঠনিসৃতার ন্যায় অমৃতময়ী হইয়া যায়। বাবাজী সম্পূর্ণ নিঃসম্বল। এরূপ নিঃসম্বল সাধু মেলায় অল্পই ছিলেন। প্রায় সকল সাধুরই মাথার উপরে কিছু না কিছু একটা আচ্ছাদন আছে, অন্ততঃ একটা ছোট ছাতাও আছে, কিন্তু এ বাবাজীর মাথার উপরে অনন্ত আকাশ বই আর কিছু নাই। বসিবার এক খানা অতি

ক্ষুদ্র ছেঁড়া চাটাইয়ের আসন। ইনি দিবারাত্র কোন প্রকার শীতবস্ত্র অথবা অন্য কোন গাত্রাবরণই ব্যবহার করেন না। পরিধানে একটী কাঠের কৌপীন। বাবাজীর আপাদমস্তকের সঙ্গে একগাছা পশুলোম বা একগাছা সূত্রের সম্পর্ক নাই। বৃক্ষ যেমন দিবানিশি শীত গ্রীষ্ম সহ্য করে, বাবাজী ঠিক সেইরূপ ষড়-ঋতুকে উপেক্ষা করেন। এলাহাবাদের ভয়ানক শীতে, সম্পূর্ণ অনাবৃত স্থান—কয়েক দিন বৃষ্টি ও হইয়াছিল—আনন্দ মূর্ত্তি বাবাজী সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইয়া তাহাতে প্রেমানন্দে দিবাযামিনী যাপন করিয়াছেন। রাত্রে ধুনী থাকে মাত্র। সাধুদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন কিন্তু এই বাবাজী, যাহা এদেশে ঘরে ঘরে প্রচলিত, সেই গুড়কুটুকু পর্য্যন্ত খান্ না। পূর্ব্বে ইনি গাঁজা খাইতেন এবং অন্যান্য নেশাও করিতেন। ইহাঁর মাদক পরিত্যাগের কারণটী অতি মনোহর। অনেক সময়ই ইনি নির্জ্জন পাহাড়ে থাকিয়া সাধন করিতে ভাল বাসিতেন। পাহাড়ে নানা প্রকার ফল ও কন্দমূল পাওয়া যায়, তাহা খাইয়া অনেক দিন কাটান যাইতে পারে, কিন্তু গাঁজা ও তামাক প্রভৃতির জন্য নীচে আসিয়া ভিক্ষা করিতে হইত। একদিকে মাদক আসক্তি এবং অন্যদিকে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য ও সাধনের অনুকুলতা, উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে ইনি সমস্ত মাদক একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ইনি জগতে কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। আমাদিগের সাক্ষাতে একজন ইহাঁকে চারিটা জামা দিলেন, ইনি দাতার মনোরক্ষার্থ তাহা হাতে রাখিলেন এবং দাতা চলিয়া গেলে বাহির হইয়া রাস্তায় যাইতে যাহাদিগকে

নিকটে দেখিলেন তাহাদিগকে দিয়া দিলেন। ইহাঁর কিছুরই যেন প্রয়োজন নাই। আনন্দমূর্ত্তি বাবাজীর আনন্দ বই আর কিছুই নাই। শরীরটী বড়ই সুস্থ ও সুগঠিত, চাহনিটীর মধ্যে একটু লুকোচুরী ভাব আছে, সেটুকু বড়ই মধুর। ইহাঁর উপদেশ দিবার অভ্যাস নাই, কথা প্রসঙ্গে দুই এক কথা যাহা বলেন তাহা সার কথা। ইহাঁকে দেখিলেই দেখা শুনা উভয় কার্য্য হয়। মনে হয় বাবাজীর অন্তর যেন প্রেম-ভক্তিতে পরিপূর্ণ। অনেকে বলেন, বাবাজীর বয়স শতাধিক বৎসর, কিন্তু দেখিতে কোনরূপেই চল্লিশ বৎসরের অধিক মনে হয় না।

মহাত্মা অর্জ্জুন দাস বা ক্ষেপাচাঁদ।—এই মহাত্মার আচার ব্যবহার কার্য্যকলাপ অতীব বিচিত্র। ইহাঁকে বিশেষ ভাবে না জানিতে পারিলে সহজে পাগল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ সাধুরা ইহাঁকে মহাপুরুষ বলিয়াই জানেন। একদিন আমাদের কাছে মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা ক্ষেপাচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এ জ্ঞান-পাগলা হ্যায়।" বস্তুতঃ অর্জ্জুন দাস যখন আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন তখনই পাগল হন, অন্য সময় জ্ঞান প্রেমের মূর্ত্তি রূপে প্রকাশিত হন। এই মহাত্মা কোনরূপ সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ করেন না। আমি যে কয়েক দিন ইহাঁকে দেখিয়াছি, দেখিলাম একটা কম্ফার্টার দিয়া কৌপিন করিয়াছেন। আমি ৫।৬ দিন দিবা রাত্রি অনেক সময়ই ইহাঁর সঙ্গ পাইয়াছি, তাহাতে ইহাঁর কতকগুলি আশ্চর্য্য শক্তি দেখিলাম। দেশ দেশান্তরের লোক আসিতেছে, কত লোকই প্রতিদিন আসিতেছে, যেখান হইতে যে আসিতেছে তাহাকেই সেই দেশীয় ২।১ জন সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে-

ছেন। মনে হয় যেন সকল দেশের সকল সাধুর সঙ্গেই তাঁহার পরিচয়। আবার কথা প্রসঙ্গে যে কেহ যে কোন শাস্ত্র হইতে একটি শ্লোক বলিল অমনি সেই স্থান হইতে অনেকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া যাইতেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে সাধুরা অনেকেই বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, সন্ন্যাসীমহাশয়েরা অনেকে কিছু জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু অর্জ্জুনদাসের কিছুই অবিদিত নাই, তিনি বিশেষরূপে সমস্তই জানেন। তিনি বাঙ্গলা কোন গ্রন্থ পড়েন নাই, বলেন এসব "ধ্যানমেমিলা"। এই বাবাজী হটযোগ ও অনেক করিয়াছেন। ধৌতি ও নানাপ্রকারের আসন প্রতিদিনই করিয়া থাকেন, সে নিয়মের অন্যথা হয় না। শরীরটী এমনি হাল্‌কা, মনে হয় যেন চলিয়া যাইতে মাটির উপরে উপরে ঈষৎ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া যান। শরীর সুগঠিত ও সুস্থ। দিবা রজনীর অধিকাংশ সময়ই নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন, মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব আনন্দ ও অপ্রাকৃত সুখব্যঞ্জক নানাবিধ শব্দ উচ্চারণ করেন, মনে হয় উহা যেন হৃদয়ভাণ্ড ভরিয়া অজ্ঞাতসারে উপচিয়া পড়িতেছে।

একবার বাবাজীকে কতকগুলি দুষ্ট লোকে প্রহার করে। যখন তাহারা মারিতেছিল তখন বাবাজী "খুব মার খুব মার" বলিয়া নাচিতেছিলেন। শাস্ত্রে সাধুর একটী বিশেষ অবস্থা বলা হইয়াছে "জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।" সাধু, জড়ের ন্যায় সহিষ্ণু ও নিশ্চেষ্ট, উন্মত্তের ন্যায় কখনও হাসেন কখনও কাঁদেন, কখনও নৃত্য, কখনও প্রলাপ করেন তিনি পিশাচের ন্যায় জীর্ণ পরিচ্ছদধারী ও বিধিনিষেধবর্জ্জিত হইয়া থাকেন। ভাগবতে

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শেষ অবস্থারও এইরূপ বর্ণনা আছে। মহাজ্ঞানী, মহাদার্শনিক ভাগবতকার মহাসাধুর যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদের ন্যায় অজ্ঞ ও অজ্ঞানেরা অনায়াসেই তাহাকে কুসংস্কার বা ভ্রম-বুদ্ধি মনে করিয়া থাকে। যাহা হউক মহাত্মা অর্জ্জুন দাস ভাগবতলক্ষণোক্ত মহাসাধু। অর্জ্জুন দাস অনাসক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ। ইহাঁর যে কোন বিষয়ে কিছু অভিলাস আছে কিছুতেই তাহা বুঝা যায় না। কোন অবস্থাই ইহাঁকে বিষণ্ণ করিতে পারে না। একবার দ্বারভাঙ্গায় ইনি রাস্তার মাঝখানে ময়ূরাসন করিয়া বসিয়াছিলেন। এক সাহেবের গাড়ী আসিয়া প্রায় তাঁহার গায়ে পড়িবার উপক্রম হইলেও, তিনি নড়িলেন না। তখন পাগল জ্ঞান করিয়া পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া পাগলাগারদে রাখিল। তাহাতে বাবাজী কিছুই আপত্তি করিলেন না। ডাক্তার সাহেব বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ইহাতে পাগলের কোন লক্ষণ নাই সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বাবাজী জেল হইতে বাহির হইয়া বলিলেন,—"বেশ ছিলাম; ক্ষুধার সময় আহার পাওয়া যাইত, দিন রাত সাধন করিতে পারিতাম, কোনই চিন্তা ছিল না।"

যাঁহারা সভ্যতাকে ধর্ম্ম মনে করেন, তাঁহারা ইহাঁকে একটী অসভ্য বই আর কিছুই দেখিবেন না।

মহাত্মা অর্জ্জুন দাসের প্রেমের কথা বর্ণন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। যে রূপেই কেহ বর্ণন করুন না কেন, তাহাতেই তাঁহাকে খাটো করা হইবে। তিনি যে জগৎকে, মনুষ্যজাতিকে কি চক্ষে দেখেন, তাহা ধারণা করিতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। সমস্ত নরনারীর মধ্যে ইনি ইহাঁর আরাধ্য দেবতা রামকে

দেখিতে পান। স্ত্রীলোক হউক, পুরুষ হউক, বালক বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু অসাধু যেই হউক, "আহা মেরা রাম" বলিয়া সকলেরই মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া এমন সতৃষ্ণ দেব-দৃষ্টিতে তাকাইয়া সকলকে আরতি করেন, যে একান্ত পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিও মুগ্ধ না হইয়া পারে না। পুলিস সাহেব একটী রাস্তায় কোন প্রয়োজনে কিছু কালের জন্য কাহাকেও যাইতে দিতেছিলেন না, ক্ষেপাচাঁদ তাঁহার মুখের কাছে হাত নিয়া এমন ভাবে আরতি করিলেন যে, সাহেব মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। ক্ষেপাচাঁদের মনুষ্য-প্রেম এক অদ্ভুত বস্তু। মানুষ দেখিলেই যেন মুগ্ধ হইয়া যান। কতলোক পাগল ভাবিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু তিনি সকলের প্রতিই প্রেমপূর্ণ। যখন সাধুরা স্নান করিতে চলিলেন, তখন ক্ষেপাচাঁদ কি করিবেন, আনন্দে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন, কত লোককেই আরতি করিতে লাগিলেন। আবার এক স্থানে দাঁড়াইয়া কিছুকাল বক্তৃতা করিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা সুগভীর ধর্ম্মতত্ত্ব। যখন তাঁহার চারিদিকে লোকারণ্য হইল, তখন দু'একটা পাগলামীর কথা বলিয়া সেখান হইতে ছুটিলেন। সে পাগলামীর কথাগুলি যে বেখাপ ও ইচ্ছাকৃত, তাহা বেশ বুঝা যায়। লোক তাঁহার দিকে বেশী ঝোঁকে, তিনি তাহা ভাল বাসেন না।

এক দিন ইহাঁর লোকানুরাগের একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমি আর ২।৩টী বাঙ্গালী বাবু একত্রে ঝুঁসী হইতে চড়ায় যাইতেছিলাম। দারাগঞ্জের পুল পার হইতেছি, তখন দেখিলাম, ক্ষেপাচাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে পুলের উপর দিয়া পূর্ব্ব মুখে চলিয়াছেন। আমরা ত দেখিয়া

অবাক্, ইনি এরূপ করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতেছেন কেন? আমরা কাছে গিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। বালক সঙ্গীদের নিকট মার খাইয়া আসিলে যেরূপ কাঁদে সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদিগকে বলিলেন,—"সিপাহী (পুলিশ) লোক আমাকে মারিয়াছে, আমি আর এদেশে থাকিব না, ভোটান চলিয়া যাইব এবং সেখানে বেল পাতার রস খাইয়া থাকিব, আর লোকালয়ে ফিরিব না।" এই বলিয়া আবার আকুল হইয়া ঠিক বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজীর কথায় আমাদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। আহা! এমন সরল প্রেম-পূর্ণ প্রাণে আঘাত করে এমন পাষণ্ডও আছে? দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্রোধেরও উদ্রেক হইল। আমরা বলিলাম, "বাবাজী, আপনি ফিরিয়া চলুন। কোন্ সিপাহী আপনার গায়ে হাত তুলিয়াছে, আমাদিগকে দেখাইয়া দিন, প্রাণপণে আমরা ইহার প্রতিবিধান করিব।" বাবাজী যেন বড়ই ভরসা পাইলেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে আরতি করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে চলিলেন। দারাগঞ্জের পুল পার হইয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বাবাজী, কোন্ সিপাহী আপনাকে মারিয়াছে দেখাইয়া দিন।" তখন বাবাজী বলিলেন,—"বাবা, আমার এই শরীর কেহ স্পর্শ করে নাই, কিন্তু আমার কাছে মারিয়াছে কাল এক ভাগলপুরীকে এবং আজ মারিয়াছে এক বুড়ীকে; তাহাতে আমার সমস্ত গায়ে বেদনা লাগিয়াছে। উহাদেরও শরীর, আমারও শরীর, আমার কাছে উহাদের মারাতে আমি বড় ব্যথা পাইয়াছি। মানুষ মানুষকে মারে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না, আমি এ লোকালয় ছাড়িয়া

যাইব” এই বলিয়া বাবাজী কাঁদিতে লাগিল। আমরা ত ঘটনা শুনিয়া বসিয়া পড়িলাম। সিপাহীর প্রতি যে ক্রোধ হইয়াছিল, তাহা কোথায় চলিয়া গেল। জগতে এক নূতন দৃশ্য দেখিলাম, মানুষ মানুষকে এত ভালবাসে, পরের ক্লেশ মানুষ এতদূর অনুভব করে, গল্পেও ত এরূপ শুনি নাই। সন্ন্যাসীরা অন্যের সুখ-দুঃখের দিকে তাকান না, মনে যে এইরূপ একটা সাহঙ্কার-কুসংস্কার ছিল, তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। আমরা লোকের জন্য কিছু খাটিয়া থাকি, তাহা যে সিন্ধুর নিকট বিন্দুও নহে তাহা দেখিতে পাইয়া দর্প চূর্ণ হইল। মনে হইল, ভগবান্ আমাকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই ঘটনা আমায় নিকট উপস্থিত করিলেন। পরের দুঃখে মনের ক্লেশে বাবাজীর আহার হয় নাই, বেলা অবসান হইয়া গিয়াছে, আমরা তখন এক দোকানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া কিছু খাওয়াইলাম।

এই বাবাজীর প্রখর বুদ্ধি, অগাধ পাণ্ডিত্য, অপরিসীম লোকানুরাগ এবং অনধিগম্য আধ্যাত্মিকতা সত্ত্বেও তিনি “জড়োন্মত্তপিশাচবৎ” হইয়া বিচরণ করেন।

মেলার অবসানে তিনি হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন। যাঁহারা সঙ্গে এবং নিকটে ছিলেন কেহই খুঁজিয়া পাইলেন না। ইহাঁর সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে। লোকে বলে ইনি কেমন করিয়া কোথা হইতে কোথা যান কেহ বুঝিতে পারে না। ইহাঁর নির্দ্দিষ্ট আশ্রম কোথায় কেহ জানে না। কেহ কেহ বলিল যে বাবাজীকে অনেক সময় বিন্ধ্যাচলে দেখা যায়। আমাদের কোন বন্ধু ইহাঁকে একদিন ইহাঁর বয়সের কথা

জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবাজী উত্তর করিলেন, "এক সময় বাবা বলিয়াছিলেন, কুড়ি বৎসর"। কথা শুনিয়া আমরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলাম না। আবার সেই বন্ধুটী বলিলেন, আপনার কি একটা হিসাব নাই? বাবাজী বলিলেন, "আমি রামনাম করি, দিন গণনা কে করে, করিতে আমার অবসরও নাই।" বাবাজী যে কথা বলিবেন না বা যে কার্য্য করিবেন না তাহা বলাইতে বা করাইতে কাহারও শক্তি নাই। কোন প্রকার তোষামোদ বা কাতরতায় তাঁহাকে ভুলাইবার সাধ্য নাই। একটী লোক কোন মোকদ্দমা জিতিবার জন্য বাবাজীর নিকট কিছু কুণ্ডের ভস্ম চাহিল। বাবাজী প্রায় ঘণ্টাধিককাল নানাবিধ কথা বার্ত্তায় তাহাকে ভুলাইয়া রাখিলেন। সে কোনরূপে বাবাজীর হাতের ভস্ম পাইল না অথচ বাবাজীর ব্যবহারে বিরক্ত হইতে পারিল না। যাঁহারা ইহাঁকে দেখিয়াছেন তাঁহাদের সকলের চিত্তপটেই ক্ষেপাচাঁদ চিত্রিত হইয়া রহিয়াছেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—বাঙ্গালাদেশে ইহাঁর নাম অনেকেই জানেন। নানাপ্রকার মত ও সাধনের মধ্য দিয়া সংপ্রতি ইনি যে ধর্ম্মে উপনীত হইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। সাধুমহলে বাঙ্গালীদের বড় আদর নাই। মৎস্যাহারী বাঙ্গালীদিগকে সাধুরা একরূপ ধর্ম্মবর্জ্জিত বলিয়াই জানেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের একমাস কাল কুম্ভে অবস্থানে অধিকাংশ সাধুরই সে সংস্কার দূর হইয়া গিয়াছে। বড় বড় মহাত্মাগণ ইহাঁকে যেরূপ প্রেম করিয়াছেন, যেরূপ শ্রদ্ধা করিয়াছেন এবং ইহাঁর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশের বিশেষ

গৌরবের কথা। মহাত্মা বড় কাঠিয়া বাবা ইহাঁর নাম করিয়া বলিতেন, "বাবা প্রেমী হ্যায়, উস্‌কা বহুৎ প্রেম হ্যায়।" বৈষ্ণবেরা কি অর্থে "প্রেম" শব্দের ব্যবহার করেন, তাহা যিনি জানেন, তিনি বুঝিবেন। গম্ভীরানাথও ঠিক ঐ কথাই বলিতেন। মেলার প্রধান প্রধান মহাত্মাগণ, যাঁহাদের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের একবার দেখা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। একদিন দেখা না হওয়াতে বড় কাঠিয়া বাবা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "হাম্ উন্‌কা দরশন্‌কা ভুঁখা হ্যায়,"—আমি উঁহার দর্শনের জন্য ক্ষুধিত। মহাত্মা দয়াল দাস আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন যে, "বাঙ্গালী বাবাকে আমি আবার কিরূপে দেখিতে পাইব।" মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা দিনের মধ্যে কতবারই ইহাঁর কাছে আসিতেন, যেন ইহাঁকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। মহাত্মা অর্জ্জুনদাস বা ক্ষেপাচাঁদ ইহাঁকে আরতি করিতেন আর বলিতেন, "সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু হ্যায়।" ক্ষেপাচাঁদ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে কি দেখিতেন, তাহা আমরা বুঝি না; কিন্তু তিনি বলিতেন, "এ বাবু সাচ্চা সাধু হ্যায়।"

অন্তর-রাজ্য বলিয়া যে একটা রাজ্য আছে, মানুষ যতদিন তাহার খবর না পায়, ততদিন সকল লোককেই সমান দেখে। মনে করে সাধুদেরও বুদ্ধি, বিবেচনা, তর্কশক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান আছে, আমাদেরও আছে। কোন কোন শক্তি আমাদের অধিক আছে, সুতরাং তাঁরা আর বড় কিসে? যে পর্য্যন্ত মানুষের এইরূপ জ্ঞান থাকে, সে পর্য্যন্ত সাধুভক্তি হয় না। মতামতের বিশুদ্ধতা অর্থাৎ সাধারণজ্ঞান যাহাকে বিশুদ্ধ মত বলে, তাহাকেই কষ্টিপাথর করিয়া

যাহারা সাধু অসাধু নির্ণয় করেন, তাঁহারা প্রকৃত সাধুতা দেখিতে পান না। তাঁহারা কেবল সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিতে পান, কিন্তু প্রাণ কোথায় তাহা জানেন না। যাহারা চিন্তার অতীত, বুদ্ধির অতীত, বিবেচনার অতীত অধ্যাত্মরাজ্য বিশ্বাস করেন, যে রাজ্যে প্রবেশ করা শারীরিক বল, বিচার বল বা বিশুদ্ধ মতের কর্ম্ম নয়, এমন রাজ্যে প্রবেশ করিতে যাঁহাদের লালসা, তাঁহারা অন্তর্নিবিষ্ট সাধুদের সাধারণ লোক মনে করেন না। যাঁহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা লম্বা জটা কি মালা-তিলক, বহুশাস্ত্র-জ্ঞান কি বিচার-পাণ্ডিত্য, এসব বড় গ্রাহ্য করেন না। দু'জন সাধুতে মিলন হইলে উভয়েই প্রায় কিছুকাল ধ্যানস্থ থাকেন, এবং অন্য কোন কথা না বলিয়াই উভয়ে উভয়কে চিনিয়া লন। কুম্ভমেলায় গোস্বামী মহাশয়কে অবিসংবাদিতরূপে সকল মহাত্মারাই মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যখন সাধুদর্শন করিতে বাহির হইতেন, তখন রাস্তার চারিধারে সকলেই তাঁহার দর্শনে আনন্দপ্রকাশ করিতেন। তাঁহাকে দেখিলেই চারিদিক হইতে "হরি বল্—হরি বল্" এই ধ্বনি উঠিত। এমন কি সন্ন্যাসীরাও তাঁহাকে দেখিয়া হরিধ্বনি করিতেন।

গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণবমণ্ডলীমধ্যে আপনার আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের কোন ভদ্রলোক তাঁহার আশ্রমের জন্য একটী বড় তাঁবু দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে যত লোক ধরে, নিরন্তর প্রায় তত লোক থাকিত। আহারের সময় যাহারা আসিয়া বসিবে তাহারাই অন্ন পাইবে,—এখানে এইরূপ নিয়ম ছিল। দৈনিক যাহা আসিত, প্রতিদিনই, ব্যয় হইয়া যাইত; পরের দিন যখন জুটিত, তখন আবার আয়োজন হইত। গোস্বামী

মহাশয়ের আশ্রমে যখন যিনি আসিয়া যে অভাব জানাইয়াছেন, প্রায় তখনই তাহা পূর্ণ হইয়াছে। কেহ আসিয়া বলিলেন, আমার কম্বল নাই,—দাও উঁহাকে দু' টাকা; কেহ বলিলেন, আমার ঘটী নাই,—দাও উহাকে এক টাকা; কেহ বলিলেন, ধুনীর কাঠ নাই,—দাও উঁহাকে এক টাকা; কেহ বলিলেন, রেলভাড়া নাই,—দাও যাহা প্রয়োজন। যতক্ষণ টাকা নিঃশেষ না হইতেছে, ততক্ষণ অনবরত এইরূপ চলিতেছে। টাকা ফুরাইয়া গেল, নিজের গাত্রবস্ত্র ও আসনের কম্বল পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। একদিন এলাহাবাদ সহরের একজন ধনী, গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইলেন। আমরা ভাবিলাম ব্যাপার কি? দেখিলাম, কয়েকজন লোক প্রকাণ্ড একটী গাঁটুরী সঙ্গে করিয়া তাঁবুর দ্বারে উপস্থিত হইল। ঐ ধনী ব্যক্তি উক্ত গাঁটুরীতে এক হাজার জামা লইয়া আসিয়াছেন। ইচ্ছা, গোস্বামী মহাশয় তাহা গ্রহণ করিয়া ইচ্ছামত বিতরণ করেন। তাঁহার দান গৃহীত হইল এবং একঘণ্টার মধ্যেই এক হাজার জামা বিতরিত হইল। গৃহীরা মনে করেন, সাধুদের মধ্য দিয়া দান করিলে দানটী বেশ নিষ্কামভাবে হইবে।

গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে গৌরনিতাই মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে সংকীর্ত্তন ও আরতি হইত। সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রেমাবতার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে এই বর দেন যে, তুমি যখনই মনে করিবে, আমি তখনই তোমার অন্তরে প্রকাশিত হইয়া তোমাকে দর্শন দিব। সন্ন্যাসের পর বিষ্ণুপ্রিয়া স্মরণ করিলেই অন্তরে স্বামীর সাক্ষাৎ দর্শন পাইতেন। কিন্তু একান্ত পতি-অনুরাগিনী, প্রিয়তমকে কেবল অন্তরে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে

পারিলেন না, সেই অন্তরস্থিত মূর্ত্তিকে বাহিরের চর্ম্মচক্ষে দেখিতে তাঁহার লালসা হইল। তখন হৃদয়স্থ মূর্ত্তির প্রতিরূপ বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অদ্যাপি নবদ্বীপধামে বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রতিষ্ঠিত সেই গৌরাঙ্গমূর্ত্তি পূজিত হইতেছে। যে ভাবে, যে প্রেম-প্রেরণায় বিষ্ণুপ্রিয়া জীবনময় ছবির প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, প্রয়াগ-চড়ায়, গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমেও সেই অনুরাগে গৌর-নিতাই মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। যে প্রয়াগে মহাপ্রভু, শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয়কে দীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রয়াগবাসীরা শ্রীচৈতন্য কি চৈতন্যধর্ম্মের নাম জানে না বলিলেই হয়। কতকাল পরে আবার সেই স্থানে গৌর-নিতাইয়ের নাম ধ্বনিত হইল। কে জানে, আবার প্রয়াগবাসী গৌরপ্রেমে ভাসিবে কি না? মেলা ভাঙ্গিল, সেই শেষ দিনে সাধুরা পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিলেন, যেন কত যুগের বান্ধবের নিকট পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। কোন প্রকার ঘটনা যাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, কোন প্রকার আসক্তিতে যাঁহারা আবদ্ধ নহেন, তাঁহাদের চক্ষে জল আসিল! গোস্বামী মহাশয়ের নেত্রযুগলে ধারা বহিল, বড় কাঠিয়া বাবার মুখমণ্ডল বর্ষণোন্মুখ মেঘমণ্ডলের আকৃতি ধারণ করিল, সকলেরই প্রাণ ব্যথিত হইল। অর্জ্জুনদাস হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, কেহই তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না!

কিসের সহিত তুলনা করিব? কি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, কেমনে তাহার বর্ণনা করিব? এই এক মাসকাল গঙ্গার চড়ায় যাহা মিলিয়াছিল, তাহাকে কি বলিব? মহামেলা বলিব? মহোৎসব বলিব? স্বর্গরাজ্য বলিব? কিছু বলিয়াই ত প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না!

চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! পুষ্পাভরণে ভূষিত শেফালিকা তরু শরতের নৈশ ঝটিকায় কুসুমশূন্য হইয়া প্রভাতে যেরূপ শ্রীহীন ও সৌরভহীন হয়, মেলাবসানে ত্রিবেণীক্ষেত্রও সেইরূপ শ্রীশূন্য হইয়াছে! সেই গঙ্গাযমুনার মিলনস্থল প্রকাণ্ড চড়াভূমি মৃতবৎসা বিধবার পুত্রহীন বক্ষস্থলের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার সম্পদশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এক প্রকাণ্ড মহানগর এক দিনের মধ্যে মহাপ্রান্তরে পরিণত হইল! দ্বাদশ বৎসর প্রয়াগভূমি সতৃষ্ণ নয়নে আবার সেই শুভদিনের প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিল।

শিক্ষা।

—•—

১। "মতের বিশুদ্ধতা দ্বারা কেহ পরিত্রাণ লাভ করে না, কিন্তু পবিত্র-জীবন লাভই পরিত্রাণের উপায়,"—এক দিন কোন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্ম-প্রচারকের মুখে এই উদার এবং সত্য-বাক্য শুনিয়াছিলাম। কুম্ভ-মেলায় এই তত্ত্বটী মূর্ত্তিমান প্রকা-শিত দেখিলাম। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমত ও আচার আচরণ লইয়া বহুপ্রভেদ। এমন কি, এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থব্যবহার্য্য বস্তু অন্য সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্য। কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী, কেহ সাকার-উপাসক, কেহবা নির্গুণ ব্রহ্মবাদী। কিন্তু ইহাদের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রকৃত ধার্ম্মিকতা রহিয়াছে। ধর্ম্ম যাহা, তাহা সকলের মধ্যেই এক ; পার্থক্য কেবল বাহিরের আচরণে। মানুষের শারীরিক গঠন বিভিন্ন হইলেও যেমন মনুষ্যত্বের একটা সার্ব্বভৌমিক মিলন আছে, প্রাণ-রাজ্যের ও হৃদয় রাজ্যের একটা একতা আছে, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃত ধর্ম্মের বিকাশ আছে। গোমুখীতে গঙ্গা অতিশয় অপ্র-শস্ত একটী খরস্রোতমাত্র, উভয়পার্শ্বের শিলাখণ্ড সকল সরা-ইয়া নির্জ্জনপথে অভ্রভেদী পর্ব্বতশৃঙ্গের মধ্য দিয়া প্রকাণ্ড অজ-গরের ন্যায় অবিরাম তীব্রগতিতে নিম্নদিকে ছুটিয়াছে। সেই গঙ্গা, প্রয়াগের সমতলভূমিতে আসিয়া, উভয়পার্শ্বস্থ ক্ষেত্র-রাজিকে শ্যামলশস্যে পরিশোভিত করিয়া, সুপ্রশস্ত প্রবাহিনী-

রূপে আপনার সৌন্দর্য্য-প্রভায় আপনি মুগ্ধ হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। গোমুখীর চঞ্চলা বালিকা প্রয়াগে যৌবন-শ্রী ধারণ করিয়া, আপনার আবেগ আপনাতে সম্বরণ পূর্ব্বক মৃদুমন্দ-ভাবে চলিয়াছে। কলিকাতায় আবার ভিন্নশ্রী; এখানে অতুল ঐশ্বর্য্যের মুকুট মাথায় পরিয়া, ঘোরতর সংসার-কোলাহলের মধ্য দিয়া রাজরাজেশ্বরীরূপে সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়াছে। গোমুখী হইতে সার-সঙ্গম পর্য্যন্ত একই স্রোত, কিন্তু বাহ্যলক্ষণ কিরূপ বিসদৃশ! কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী, কোথাও শ্যামল সমতল ক্ষেত্র, কোথাও জন-কোলাহলপূর্ণ মহানগরী, কোথাও শ্বাপদা-কীর্ণ ভীষণ অরণ্যের মধ্য দিয়া এই স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। কোথাও ঋজু, কোথাও কুটিল, কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও প্রশস্তভাবে বিভিন্ন অভিমুখে ইহার গতি হইয়াছে। কোন এক ব্যক্তিকে গোমুখীতে গঙ্গা দেখাইয়া যদি প্রয়াগে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আবার সেখান হইতে কলিকাতায় লইয়া আসা যায়, সে কখনও বুঝিতে পারিবে না যে, এই সকল স্থানেই সেই একই নদী। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি গোমুখীর স্রোতে অবগাহন করিয়া বরাবর সেই স্রোতেই ভাসিয়া ডুবিয়া আইসে, তবে বাহ্যিক সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহার কখনও সন্দেহ হইবে না যে, এই সমস্ত একই স্রোত কি না? সেই প্রকার মানুষ যতদিন ধর্ম্মরাজ্যে তড়ে (খুঙ্কিতে) হাঁটে, বাহিরের কতকগুলি পার্থক্য, কতকগুলি মতামতের কাটাকাটি দেখিয়া সে মনে করে, এই সকল ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু যখন অন্তর-নিহিত একটা নিগূঢ় স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, তখন সমস্ত বৈচিত্রের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিতে পায়, সমস্ত বিবাদের একই

মিলনে পরিণতি হয়। তখন মত লইয়া সম্প্রদায় হয় না, এবং অলক্ষ্য সাংসারিকতা-মিশ্রিত স্বদলবদ্ধ সংকীর্ণ প্রেম আর গণ্ডীর মধ্যে থাকে না। হৃদয় এমন একটী উদার ভূমি প্রাপ্ত হয় যে, সকল সম্প্রদায়, সকল দলকেই সেখানে সযত্নে বসাইতে পারে। আমার মত যে বিশ্বাস করে না সে সুবোধ নহে, এবং আমার আচরণের ন্যায় যে আচরণ করে না সে ধার্ম্মিক নহে, এইরূপ দূষিত-জ্ঞান তখন বিদূরিত হয়। কুম্ভমেলা সন্দর্শন করিলে এই ভাবগুলির সাকার মূর্ত্তি প্রাণে প্রকাশ পায়।

২। এক সময় দেশের কোন একজন প্রধান ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যাঁহারা নির্জ্জনে থাকিয়া গভীর ধ্যান করেন, তাঁহাদের দ্বারা জগতের কি কল্যাণ সাধিত হয়?" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যতদূর মানসম্ভ্রম ও উচ্চপদের প্রত্যাশা করা যায়, তাহা আপনার লাভ হইয়াছে; অর্থসামর্থ্য, সামাজিক মর্য্যাদা, পারিবারিক সুখ, আপনার যথেষ্ট আছে; আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, এ সমস্ত লইয়া আপনি শান্তিলাভ করিয়াছেন কি?" তিনি অতি মহাশয় ব্যক্তি, সরল ভাবে বলিলেন—"না, আমি শান্তিলাভ করি নাই।" আমি বলিলাম, "আপনার ন্যায় সর্ব্বস্ব পাইয়াও যাঁহাদের শান্তি নাই, ঐ সকল ধ্যানস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে শান্তি-পথ দেখাইয়া দেন।" বস্তুতঃ, মানুষ যতদিন কোন নিত্যভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, ততদিন সদসৎ কোন কার্য্যেই তাহাকে স্থির-শান্তি দান করিতে পারে না। শয্যাগত রোগীর মুখে একটু মিষ্টান্ন দিলে যেমন তাহার সাময়িক কিছু সুখ হয়, কিন্তু স্থায়ী যন্ত্রণার নিবারণ হয় না, পৃথিবীর কার্য্যাকার্য্যদ্বারা

জীবের সুখও সেইরূপ। এইজন্য গভীর ধ্যানের দ্বারা আগে ভগবান্‌কে জানিতে হয়; তাহার পর যে কার্য্য করিবে, তাহাতেই পূর্ণশান্তি। তবে ব্রহ্মলাভের পূর্ব্বে কোন কার্য্য করিবে না এরূপ নহে; কিন্তু সে কার্য্য তপস্যামাত্র, তাহা সেবানন্দ নহে। সেবক না হইয়া সেবা করা যায় না; কর্ত্তাকে না পাইলে, তাঁহার হুকুম না শুনিলে সেবক হওয়া যায় না। দুষ্কার্য্য হইতে বিরত না হইলে, শান্ত ও সমাহিত না হইলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয় অর্থাৎ মোহপাশ বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। এই সকল অগ্র-পশ্চাৎ লক্ষণের সহিত মিলাইয়া স্থির করিতে হয়, আমি কোন্ শ্রেণীর জীব? নতুবা ভ্রম হয়। স্বেচ্ছাচারিত, অনুকরণোত্তেজিত বা গতানুগত ভাবে কর্ম্ম করিয়া তাহাতে যে একপ্রকার আনন্দ হয়, তাহাকেই সেবানন্দ বলিয়া ভ্রম জন্মে। বস্তুতঃ, আগে কর্ত্তা, পরে সেবক, তাহারই পরে সেবা হয়। সেবক না হইয়া কর্ম্ম করিলেই সে কর্ম্মে "আমিত্ব" থাকে। এই তত্ত্বটী যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহারাই ধ্যানধারণা অপেক্ষা সৎকার্য্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, এবং সাধুসন্ন্যাসীদিগকে জগতের ভারস্বরূপ বোধ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কিঞ্চিৎ উদার; তাঁহারা বলেন, ধ্যান করাও মন্দ নয়, কর্ম্ম করাও মন্দ নয়, সকলই ধর্ম্ম। হিন্দু সাধুরা কিন্তু বলেন, গভীর ধ্যান ভিন্ন ধর্ম্মকে ধরারই উপায় নাই। সমস্ত সৎকার্য্য ও রীতি নীতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়, কিন্তু ধ্যানই ধর্ম্মের প্রাণ। ধ্যান ভিন্ন ধর্ম্মসাধন, প্রাণহীন দেহে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালনের ন্যায় বাহ্যদৃশ্যে সজীবতা রক্ষা মাত্র। এই জন্যই এ দেশের সাধুরা সমস্ত কার্য্যাপেক্ষা

ধ্যানের জন্য লালায়িত, ধ্যানের জন্যই ইহাঁদের উদাসীনতা ও কৃচ্ছ্র-সাধন। ইহাঁদের দৃষ্টান্তে জগতের কল্যাণ, ইহাঁদের জীবন-ধারণই ধর্ম্মপ্রচার।

৩। কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কুম্ভমেলায় যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গেল, তাহাতে দেশের কি কল্যাণ সাধিত হইল? এই অসংখ্য টাকা দ্বারা কতকগুলি স্থায়ী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত।" আমি অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্র বুঝি না; কিন্তু কল্যাণ শব্দটার একটা মোটামুটী অর্থ বুঝি। যাহাতে মানবাত্মার কল্যাণ হয় অর্থাৎ হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, তাহাকেই আমি কল্যাণ বলি। সে কল্যাণ, অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারাও হইতে পারে, আর মুদ্রামুষ্টি ধূলিমুষ্টির ন্যায় ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিলেও হইতে পারে। একজন সাধুর নিকট (মহাত্মা দয়ালদাস) কোন ধনী এক বস্তা টাকা লইয়া করযোড়ে বলিলেন—"বাবা, আমার টাকাটা তোমার আশ্রমে সাধুসেবায় লাগাইয়া দাও।" সাধু বলিলেন,—"কি করিব বাবা, এখানে আর আজ হইবে না; পূর্ব্বে যাহারা টাকা দিয়াছে, তাহাদের থাকিতে তোমার টাকা কিরূপে খরচ করিব? তুমি অন্যত্র যাও।" এই দৃশ্যটী দেখিয়া আমার প্রাণের যে কল্যাণ হইল, সাধু যদি ঐ টাকা লইয়া কোন বিশেষ সদ্ব্যয়ও করিতেন, তাহা দেখিয়া সেইরূপ কল্যাণ হইত কি না, বলিতে পারি না। আর এক কথা এই যে, অর্থকে এইরূপ জলের মতন না দেখিলে, শিলাবৃষ্টির ন্যায় টাকাও আসিত না।

৪। অনেকের সংস্কার আছে যে, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাকারবাদ কি অবতার-বাদ প্রভৃতি

মানিতে পারেন না। এখানে দেখিলাম, যাঁহারা বিচারে ও সাধনে ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহারাও অবতার-বাদ মানেন এবং সাকার-বাদকেও অগ্রাহ্য করেন না। যদি কেহ বলেন, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তবে তাঁহারা হয় ত মনে করেন যে সাকার-বাদ ও অবতার না মানাই ব্রহ্মজ্ঞানের একটী বিশেষ লক্ষণ; কিন্তু এরূপ হাত-গড়া লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া জীবন্ত সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

৫। "না করিবে অন্য দেবের নিন্দন বন্দন"—চৈতন্য-ধর্ম্মের এই মহামন্ত্র সাধুদিগের জীবনে মূর্ত্তিমান্ দেখিলাম। সাধুরা পরনিন্দাকে চুরী কি ব্যভিচার অপেক্ষা কোন অংশে কম নিন্দনীয় মনে করেন না। পরনিন্দা ও আত্ম-প্রশংসা এই উভয়কেই মিথ্যাবাক্য মধ্যে গণনা করেন। মিষ্টান্নের দোকানে নানাবিধ খাদ্য সজ্জিত থাকিলেও, তুমি যেটা বড়ই ভাল বাস, অন্যান্য সকল বস্তুকে অতিক্রম করিয়া তোমার চক্ষু বিশেষ-ভাবে সেইটীতেই সংলগ্ন হইবে। সাধুদের মনের টান গুণের দিকে সুতরাং তাঁহারা যাহাকে দেখেন, তাহারই গুণটুকু আগে দেখেন এবং তাহাতেই আসক্ত হন; কাজেই পরনিন্দা ইহাঁদের ঘটিয়া উঠে না। আমাদের কোন বন্ধু মহাত্মা অর্জ্জুনদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "খৃষ্টানেরা কেমন লোক? তাহারা ত সকল জাতির সঙ্গে একত্র আহার করে, জাতি মান্য করে না।" তিনি বলিলেন, "আহা, ও ত ফকীরি ভাব, অতি চমৎকার।" খ্রীষ্টের কথায় সাধুরা বলেন "তিনি ত বিদেহ-মুক্ত মহাপুরুষ।" শেখা ধর্ম্ম আর ফোটা ধর্ম্ম দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু। কাহারও নিন্দা করা উচিত নয়, এই শিক্ষা পাইলাম; মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া নিন্দাবাক্য

প্রকাশ করিলাম না, ইহা শেখা ধর্ম্ম। ভগবানের নামে রুচি হওয়ায় দোষ-দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, যেদিকে তাকান কেবল গুণেরই দর্শন হয়, নিন্দার বিষয় অপেক্ষা প্রশংসার বিষয়ই প্রাণে জাগিয়া উঠে, ইহারই নাম ফোটাধর্ম্ম। যাঁহাদের ধর্ম্ম ফুটিয়াছে, তাঁহারাই শান্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না এবং কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্নও হন না। যাহারা পরনিন্দা—পরচর্চ্চা করে, সাধুদের মতে তাহারা ধর্ম্মের প্রথম স্তরেও পদক্ষেপ করে নাই।

কুম্ভ-মেলায় অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিন্মাত্র উল্লিখিত হইল।

সাধুসঙ্গ।

—•◌•—

—সাধুরা নিরাকারের সাকারমূর্ত্তি। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা, সরলতা, এ সকল নিরাকার বস্তু। সৌন্দর্য্য যেমন পদার্থের মধ্য দিয়া বিকশিত না হইলে মানুষ তাহাকে জানিতে পারে না, ঐ সকলও সেইরূপ ব্যক্তির অন্তরে না ফুটিলে কিছুতেই স্বরূপ প্রকাশিত করে না। ভক্ত মানি না ভক্তি মানিব, সাধু মানি না সাধুতা মানিব,—এ সকল কথার কথা মাত্র। সুন্দরকে চাহি না, কিন্তু সৌন্দর্য্যকে ভালবাসি—ইহা একটা প্রহেলিকা। কাহারও ভক্তি ফুটিয়াছে কি না ইহা যদি জানিতে হয়, তবে দেখিব ভক্তের প্রতি তাহার কিরূপ ভাব। ভক্ত-সঙ্গ-মুক্তিলাভের প্রধান উপায় এবং ভক্ত-সঙ্গ ভক্তি-বিলাসের প্রধান ক্ষেত্র। ভক্তকে যে ভক্তি করে, ভগবান্ তাহার ভক্তি গ্রহণ করেন।

"যে মে ভক্তজনা পার্থ ন মে ভক্তাশ্চতে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাশ্চ তে নরাঃ॥"

ভগবান বলিলেন, "হে অর্জ্জুন, যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমার (প্রকৃত) ভক্ত নহে, কিন্তু আমার ভক্তের যাহারা ভক্ত, তাহারই আমার (প্রকৃত) ভক্ত।"

"মদ্ভক্তবল্লভ যস্য স এব মম বল্লভঃ।
তৎপরো বল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়॥

আমার ভক্ত যাহার বল্লভ সেই আমার বল্লভ। হে ধনঞ্জয়, সত্য সত্য, তাহার অধিক আর বল্লভ নাই।

সাধুসঙ্গের অপার মহিমা, ভক্ত-জীবনের অপার মহিমা শাস্ত্র-কারেরাই বুঝিয়া ছিলেন। দোষ-দৃষ্টি-যুক্ত আমরা কেবল তর্ক-জাল বিস্তার করিয়া সাধুদিগকে হৃদয় হইতে দূরে রাখিতে চাই। যোগীবর ঈশা বলিয়াছেন, "যে পুত্রকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিয়াছে।" জ্ঞানাবতার শঙ্কর বলিয়াছেন, "ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।" সাধু-সঙ্গরূপ ভব-নদীপারের তরণী ঘাটে ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে, অথচ অহঙ্কারে অন্ধনেত্র হইয়া আমরা স্বেচ্ছাচারে ঘুরিয়া মরিতেছি।

সাধুদিগের প্রেম এক অদ্ভুত বস্তু। সে প্রেম, সংসার-লালসাকে উদ্রিক্ত করে না, কিন্তু পরিশ্রান্ত মানবাত্মাকে বিশ্রাম প্রদান করে। সাধুদিগের পরস্পরের প্রেম কি অপার্থিব! যাঁহারা সংসারের কোন ধারই ধারেন না, কিছুতেই আসক্ত নহেন, তাঁহারাও সাধুপ্রেমে মুগ্ধ! কুম্ভমেলার অবসানে, সেই শেষ বিদায়ের দিনে, যখন সাধুরা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখনকার ভাব কি চমৎকার! কাহারও গণ্ডস্থল বাহিয়া প্রেমাশ্রু পতিত হইতেছে, কাহারও মুখমণ্ডল অপার্থিব অনুরাগ-ভবে রক্তিম আভা ধারণ করিয়াছে! সতৃষ্ণ লোলুপ-দৃষ্টিতে পরস্পরকে হৃদয়ে ভরিয়া দেখিয়া লইয়া সাধুরা বিদায় গ্রহণ করিলেন, সকলের হৃদয়ে সকলে চিরকালের জন্য চিত্রিত হইয়া রহিলেন।

কুম্ভমেলা ফুরাইল, চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল, কৃষ্ণশূন্য বৃন্দারণ্যের ন্যায় শূন্যভূমি নীরব পড়িয়া রহিল। যে দৃশ্য দেখিয়াছি, জাগ্রতে স্বপ্নে তাহার ছায়া প্রাণের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; শুষ্কতার সময় এখনও তাহা ভাবিলে প্রাণ সরস হয়, পাপে তাপে

এখনও সে দৃশ্য হৃদয়কে সতেজ রাখে। মেলা ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সাধুরা দেশদেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, আমরা ত বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি ; কিন্তু এখনও মনে ইচ্ছা হয়, সেই পুণ্যসলিলা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে, সেই ত্রিবেণীক্ষেত্রের প্রকাণ্ড চড়াভূমিতে, সেই ভক্ত-পদরজ-পূত প্রশস্ত পুণ্যক্ষেত্রে, একবার হরি হরি বলিয়া গড়াগড়ি দিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করি।

সাধুরা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন,
ভক্তেরা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন,
জগন্মঙ্গল হরিনাম আমাদের জীবনে
জয়যুক্ত হউক।

ওঁ শান্তিঃ।

প্রয়াগধামে কুম্ভ-মেলা।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত।

মূল্য ।০ চারি আনা।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অভিমত—

"কুম্ভ-মেলা" অতি সুন্দর ও মনোহর পুস্তক হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় সাধু মহাত্মাদিগের নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ চরিত্রের যে জীবন্ত চিত্র আপনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা হৃদয়-উন্মাদকারী ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। এই ত্রিতাপ-জ্বালাপূর্ণ সংসারে আপনার এই পুস্তকখানি অতীব শান্তিপ্রদ হইয়াছে।

স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত—

"আপনার "প্রয়াগধামে কুম্ভ-মেলা" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। কুম্ভ-মেলার পবিত্র দৃশ্য আপনার পবিত্র হৃদয়ে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, আপনার সরল ও ভাবপূর্ণ ভাষায় আপনি তাহার একটী অতি সুন্দর প্রতিলিপি এই পুস্তকে চিত্রিত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা মেলাদর্শন যাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাঁহাদের অনেকটা ক্ষোভ নিবারণ হইবে। আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন এবং এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করাতে আমি মনের সহিত আপনার ধন্যবাদ করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অভিমত—

"এই পুস্তিকায় তাঁহাদের (সাধুদিগের) অপূর্ব্ব লোকানুরাগ, মায়া, প্রীতি, দয়া ও দানশীলতার কথা পড়িয়া যেমন মুগ্ধ ও

চমৎকৃত, তেমনই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তত্ত্বজ্ঞানমূলক না হইলে কর্ম্ম যে বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম হয় না, মনোরঞ্জন বাবু তাহা বুঝাইয়াছেন। তিনি আমাদের ধর্ম্ম-সাহিত্যের বড় উপকার করিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভিমত—

"আপনার "কুম্ভ-মেলা" আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে বৃহৎ ; ইহার প্রতি পংক্তিতে ভক্তিসুধা উথলিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র রজনীগন্ধা, ক্ষুদ্র জুঁই যেভাবে লোকগণকে আমোদিত করিতে সক্ষম, এ পুস্তকও সেইরূপ শক্তি ধারণ করে এবং ক্ষুদ্র কুসুমগুলির ন্যায় ইহাও সঙ্কেতে স্বর্গের কথা জ্ঞাপন করে।"